

সরকারি ফরমানের প্রদীপে অন্ধকার আরও ঘন হল

শাসকের দীপ জ্বালাবার ফতোয়া মেনে শাসিত যে দীপ জ্বালে তাতে আঁধার কাটে না, বরং তা ঘন হয় আরও — এ সত্য আবার দেখিয়ে দিল কেন্দ্র এবং রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি সরকার।

পরাদীন ভারতে ব্রিটেনের যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে এমনই এক সমারোহের ফতোয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নজরুল ডাক দিয়েছিলেন — ‘কার তরে জ্বালো উৎসব দীপ? দীপ নেভাও। নর নারায়ণে ক’রে আঘাত আসিছে তাদের

রাজকুমার, দীপ নেভাও’। সে দিন শাসকের ফতোয়া মেনে যে দীপ জ্বলেছিল তা ছিল ঘন কালো তমসার প্রতীক। আর সুভাষচন্দ্র বসুর মতো সংগ্রামীরা তা নিভিয়ে দিয়ে কোটি কোটি মানুষের মনে জ্বালিয়েছিলেন পরাদীনতার শৃঙ্খল ভাঙার মুক্তি-যজ্ঞের আগুন।

আজ স্বাধীন ভারতে আবার ১৭ সেপ্টেম্বর স্কুল, কলেজ, সরকারি অফিস, রাস্তা, সেতু সহ সর্বত্র যে দীপ জ্বালানোর **দুয়ের পাতায় দেখুন**

পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপি দুষ্কৃতীদের বর্বর হামলা



কোচবিহারে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী এবং এআইডিএসও কর্মীদের উপর এবিভিপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ১৬ সেপ্টেম্বর বর্বর হামলা চালায়। এর তীব্র নিন্দা করে কোচবিহার শহরে পর দিন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি দুষ্কৃতীদের কঠোর শাস্তি এবং ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনার দাবিতে ধিক্কার মিছিল করে। বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

মনীষীদের নামাক্ষিত রাস্তার নাম পরিবর্তন চরম নিন্দনীয়

অন্য বাম দলগুলিকে এস ইউ সি আই (সি)-র চিঠি

মনীষীদের নামাক্ষিত রাস্তার নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদে সম্মিলিত নাগরিক কনভেনশনের প্রস্তাব দিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৬ সেপ্টেম্বর বামপন্থী দলগুলির কাছে একটি চিঠি পাঠান।

চিঠিতে তিনি বলেন, আমরা সকলেই সংবাদমাধ্যমে লক্ষ করলাম, কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান যে সব রাস্তাগুলি দেশবিদেশের বিভিন্ন মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে তাঁদের নামাক্ষিত আছে, রাজ্যের বিজেপি সরকার সেই সব রাস্তার নাম পরিবর্তন করতে চাইছে। এই সব মনীষীরা মানবসভ্যতার অগ্রগতির স্বার্থে নিজেদের কীর্তির মধ্য দিয়েই খ্যাত হয়েছেন, মানুষের শ্রদ্ধা পেয়েছেন। আজ হঠাৎ তাঁদের নাম

মুছে ফেলার এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং সভ্যতারবিরোধী।

আমরা দৃঢ় ভাবে মনে করি, সরকারি এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সম্মিলিত নাগরিক প্রতিবাদ হওয়া দরকার। এ জন্য বামপন্থী দলগুলিকেই উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের প্রস্তাব, প্রকাশ্য নাগরিক কনভেনশন করে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করতে হবে।

এই উদ্দেশ্যেই বামপন্থী দলগুলির মধ্যে আলোচনার জন্য আমাদের একটি বৈঠকে মিলিত হওয়া দরকার। সে জন্য সকলের সুবিধামতো একটি দিন স্থির করতে হবে। ওই বৈঠকেই আমরা স্থান, সময় ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে নিতে পারব। আপনারা সহমত হলে জানান। কথা বলেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া যাবে।

শিক্ষানীতি নিয়ে কর্মশালা ত্রিপুরায়

অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি, ত্রিপুরা চ্যাপ্টারে উদ্যোগে ১৩ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ দক্ষিণী সভাগৃহে ‘জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র সর্বনাশা প্রভাব’ ও তার বিকল্প হিসাবে ‘জনগণের শিক্ষানীতি ২০২৬’ বিষয়ে কর্মশালা হয়। জাতীয় শিক্ষানীতির ফলে গত ছ’বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে কী পরিবর্তন এসেছে এবং কী সর্বব্যাপক সমস্যা তৈরি হয়েছে তা নিয়ে কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। জাতীয় শিক্ষানীতির ক্ষতিকর

দিকগুলি চিহ্নিত করে এ দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের তত্ত্বাবধানে ব্যাপক জনগণের মতামতের ভিত্তিতে গত ২৪ জানুয়ারি ব্যাঙ্গালোরে জনগণের পার্লামেন্ট সংগঠিত করে যে ‘জনগণের শিক্ষানীতি ২০২৬’ গৃহীত হয়, তার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও আলোচনা হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন হরকিশোর ভৌমিক।

প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন কমিটির

আটের পাতায় দেখুন



ভয় লেনিনের মতাদর্শকে এ জন্যই মূর্তি ভাঙা

আমেরিকার কবি ল্যান্ডস্টন হিউজ লিখেছিলেন—

“Lenin walks around the world
Frontiers cannot bar him. Neither
barracks nor barricades impede
nor does barbed wire scar him.”

(বিশ্বব্যাপী ছুটছে লেনিন

এ-দিক থেকে সে প্রান্তে

লেনিন যাবে আটকে পথে

কোথায় তেমন সীমান্ত?)

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যর ভাবনায় লেনিন উঠে এসেছিলেন এই ভাবে—

‘লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে,
ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ
বিপ্লব স্পন্দিত বুক মনে হয়
আমিই লেনিন।’

এই ছিল বিশ্ব জুড়ে লেনিন নামের আবেদন, যা ধরা আছে এই বাংলার তথা বিশ্বের অসংখ্য কবিতা-গল্প নাটকে,



বড় মানুষদের স্মৃতিচারণায়। কাজেই, দেশের সীমান্ত বা কাঁটাতার লেনিনের আবেদনকে কোথাও আটকে রাখতে পারে না। দেশে দেশে মেহনতি মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে জীবন্ত প্রেরণা হয়ে কাজ করেছে লেনিনের নাম, তাঁর শিক্ষা

ও সংগ্রাম। তাঁর হাতে গড়া সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন গোটা বিশ্বের কাছে হয়ে উঠেছে বাস্তবের মাটিতে শোষণমুক্তির স্বর্গরাজ্য। আজ যখন বিজেপি এবং সংঘ পরিবার কলকাতার যাদবপুরে লেনিন মূর্তিকে আক্রমণ করে, রাজ্যের নানা জায়গায় তাগুব ও গুন্ডামি চালায়, তখন প্রমাণ হয়ে যায়, আজ এই একবিংশ শতকেও লেনিনের মূর্তি ভয়ানক কাঁপন ধরাচ্ছে শাসকের বুক। রাজ্যে রাজ্যে, দেশ জুড়ে বিজেপির অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ যত দানা বাঁধছে, চতুর্দিকে ফেটে পড়ছে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ-আন্দোলন, তাতে নতুন করে মেহনতি মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে মার্ক্সবাদের প্রতি, মার্ক্সের সুযোগ্য ছাত্র রুশ বিপ্লবের রূপকার মহান লেনিনের প্রতি। সেই আকর্ষণকেই মূর্তি

সাতের পাতায় দেখুন

জুনপুটে মিসাইল কেন্দ্র স্থাপনের বিরোধিতা

পূর্ব মেদিনীপুরে কাঁথির জুনপুটে মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপনের তীব্র বিরোধিতা করে ১৭ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিল ‘জুনপুটে মিসাইল ও হরিপুরে পরমাণু চুল্লি বিরোধী গণপ্রতিরোধ মঞ্চ’। মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক অমিত মান্না, বিশ্বজিৎ রায় বলেন, ২০১৪ সালে যখন জুনপুটে মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা শুরু হয় তখন থেকেই আমরা প্রতিবাদ আন্দোলনে আছি।



মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন, হাজার হাজার মৎস্যজীবীকে উচ্ছেদ করে ঘন বসতিপূর্ণ জুনপুটে মিসাইল কেন্দ্র কেন? প্রতিরক্ষার স্বার্থে যদি মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র করতেই হয় তা হলে নির্জন এলাকায় করা হোক। গণপ্রতিরোধ মঞ্চের এক নেতা বলেন, পূর্বকার সরকারগুলিও হরিপুরে পরমাণু চুল্লি স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছিল। ব্যাপক উচ্ছেদের আশঙ্কায় গ্রামবাসীরা আন্দোলনে নামেন। সরকার তখন সাময়িক ভাবে কাজ স্থগিত রাখলেও প্রকল্প থেকে পুরোপুরি সরে আসেনি। জুনপুটে মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র হওয়া মানে পুরো এলাকা মিলিটারি দখলে চলে যাওয়া। আস্তে আস্তে হরিপুরের পারমাণবিক চুল্লি স্থাপনের পরিকল্পনাও বাস্তবায়িত করা। কমিটির স্পষ্ট বক্তব্য, এই প্রকল্প জনশূন্য স্থানে করা হোক।

হোমিওপ্যাথি ডিপ্লোমা ডাক্তারদের সার্টিফিকেট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদ

জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার সম্প্রতি হোমিওপ্যাথি সহ সমস্ত রকম আয়ুশ ডিপ্লোমাধারী ডাক্তারদের জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নিয়েছে। এর ফলে বিশেষত প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ সমস্যায় পড়েছেন। বাড়িতে মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত্যু সার্টিফিকেট পাওয়া তাঁদের পক্ষে জটিল হয়ে পড়ছে।

উল্লেখ্য, ১৯৬৩ সাল থেকেই ডিএমএস ডিপ্লোমাধারী চিকিৎসকরা জন্ম-মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিতে পারতেন। ১৯৯৫ সালে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে ডিএইচএমএস ডিপ্লোমাধারী ডাক্তাররা সেকেন্ড সিডিউল-এর অন্তর্ভুক্ত হন এবং সেই থেকে তারাও জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেট দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন।

রাজ্য সরকার

ডিএইচএমএস চিকিৎসকদের সেই অর্জিত অধিকার এবং ডিএমএস চিকিৎসকদের বহু দিনের অধিকার কেড়ে নিল। যা অন্যায়, অযৌক্তিক জনস্বার্থবিরোধী। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার প্রতিবাদ জানিয়ে ১৬ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্যভবনে ডেপুটি হেলথ সেক্রেটারি তথা স্টেট ডেথ-বার্থ রেজিস্ট্রার এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে ডেপুটেশন দেয়। কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দেন অর্জিত এই অধিকার দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু করা হবে।

নেতৃত্ব দেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সহসভাপতি ডাঃ সজল বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি ডাঃ তিমির কান্তি দাস, যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম, ডাঃ মতিলাল গিরি, ডাঃ পবন সাহ প্রমুখ।



সরকারি ফরমানের প্রদীপে

একের পাতার পর

ফতোয়া দিল বিজেপি সরকার— তা সংখ্যায় যত লক্ষ, যত হাজারই হোক না কেন তার আলোয় জনজীবনে নেমে আসা সংকটের নিকষ কালো অন্ধকারের ছায়াটা হালকা হওয়ার বদলে যেন আরও ঘোর হয়ে চেপে বসল। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে দেশে যত লক্ষ দীপ জ্বলুক, তাতে যত শত মণ তেলই পুড়ে থাকুক না কেন পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার ভূতনিত, বিহারের জেলায় জেলায় বানভাসি হাজার হাজার মানুষের ঘরে সে দীপের আলো কোথায়? সারা দিন ধরে একটু ত্রাণ জোগাড় করতে গিয়ে প্রতিবেশীর সাথে কাড়াকাড়ি করার পর সে দিন সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারে দেহ-মনে বিধ্বস্ত বানভাসি মানুষের অন্তরে তখন হৃদয়হীন প্রশাসনের প্রতি ধিক্কার, তাদের দীর্ঘশ্বাসে ভারী গোটা ভারতের বাতাস। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনের সমারোহে ‘আশীর্বাদ কি দিয়া’ জ্বালানোর ফরমান তীব্র বিদ্রূপের মতোই শুনিয়েছিল তাদের কানে। এ দীপ জ্বলার মাত্র তিন দিন আগে এমনই এক সন্ধ্যার অন্ধকারে রাজধানী দিল্লির স্বরূপনগরে গণধর্ষিতা ও নরপশুদের হাতে নিহত কিশোরীর মৃতদেহ খুবলে খেয়েছে পথকুকুরের দল। সেই গভীর অন্ধকারে এতটুকু আলো পৌঁছানোর সাধ্য কোথায় এ দীপের! মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে প্রদীপ জ্বলার সময় যে মুখগুলো ছিল অন্ধকারে, প্রদীপ নিভে যেতে সে মুখগুলোই একটু উজ্জ্বল হল। প্রদীপের পোড়া তেল বোতলে ভরতে পারাই সে দিন তাদের জন্য ‘আশীর্বাদ’— অভাবের সংসারে রাজবাড়ির

উৎসবের উচ্ছ্বসই যে সম্বল!

নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন পালনে ‘আশীর্বাদ কি দিয়া’ জ্বালানোর নির্দেশ মানতে যে সব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বাধ্যতামূলক হাজিরা দিতে হয়েছে, বিজেপির ভোটের প্রতীক ‘পদ্ম’ তৈরি করে তার ছবি সরকারি পোর্টালে আপলোড করতে হয়েছে— তাদের স্কুলবাড়ির অবস্থা কেমন, মিড ডে মিলের নামমাত্র বরাদ্দে তাদের বাস্তবকে তটুকু খাবার জোটে, তাদের স্কুলে পর্যাপ্ত সংখ্যায় শিক্ষক এবং পরিকাঠামো আছে কি না এ সবের খোঁজ কে নিল? প্রদীপ জ্বালিয়ে কোন আশীর্বাদ পেল তারা? এ জন্যই একটি ভগ্নপ্রায় স্কুলবাড়ি জন্মদিনে মোদিকিকে ‘উপহার’ দিতে চেয়েছেন ছাত্র-যুবরা! এর পর আবার ১২ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে নরেন্দ্র মোদির গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রিত্ব এবং প্রধানমন্ত্রিত্বের ২৫ বছর পূর্তির ‘সেবা সংকল্প অভিযান’। নরেন্দ্র মোদিকে মহামানব বানানোর জন্য বিজেপির অভিযান চলছে অনেক দিন ধরেই। নরেন্দ্র মোদি নিজেই নিজেকে ‘নন বায়োলজিক্যাল’— কার্যত দৈব-সিদ্ধ মহাপুরুষ হিসাবে ঘোষণা করে চরম নির্লজ্জতার প্রমাণ রেখেছেন আগেই। কিন্তু সরকারি পরিকাঠামো ব্যবহার করে জনগণের পয়সায় এই বারের জন্মদিনের সমারোহ সব দিক থেকে নির্লজ্জতার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

নরেন্দ্র মোদির শাসনকালে কেমন ‘সেবা’র নির্দর্শন রেখেছেন তিনি? গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ২০০২-এ গণহত্যা তাঁর সেবার অন্যতম নির্দর্শন! যার ভয়াবহ স্মৃতি জাগিয়ে দিয়ে ২০২২-এ বিলকিস বানোর ওপর গণধর্ষণ

চালানো ও একাধিক মানুষের নৃশংস হত্যাকারীদের ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করার ‘সেবা’ ঘটেছে নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রিত্বেই। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বেই সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে যাওয়া বেকারত্বকে চাপা দিতে মিথ্যা পরিসংখ্যানের ‘সেবা’ দেখেছে মানুষ। ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি, আর্থিক বৃদ্ধির মিথ্যা পরিসংখ্যান এ সব তো আছেই। আছে বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারতের ক্রমাগত তলিয়ে যাওয়া। দারিদ্রের নিরিখে সাহারা মরুভূমির আশেপাশের দেশগুলোর সাথে ভারতকে এক সারিতে দাঁড় করিয়েছে নরেন্দ্র মোদির শাসনকালই।

এর সাথে যুক্ত হয়েছে গণতন্ত্রকে হত্যা করার নিত্য নতুন ‘সেবা’। ভারতের সংসদ বিগত বারো বছরে কোনও আলোচনা ছাড়াই আইন পাশের রেকর্ডের শীর্ষে পৌঁছে গেছে। সাংবাদিকদের স্বাধীনতা, শিক্ষাক্ষেত্রের স্বাধীনতার তালিকায় ভারত নামতে নামতে একেবারে তলার দিকে পৌঁছে গেছে। নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে সমস্ত সাংবিধানিক সংস্থাকে দলের কুক্ষিগত করার রেকর্ডে নরেন্দ্র মোদি শাসন সকলের সেরা। এই ১২ বছরে ভারত দেখেছে কেমন করে সংবিধানের নামে শপথ নেওয়া প্রধানমন্ত্রী দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিন্দু করতে পারেন! কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার জোরে দেশ জুড়ে ঘৃণাভাষণ, গো-রক্ষার অভ্যুত্থানে মানুষকে পিটিয়ে মারার পরেও কোনও শাস্তি না হওয়ার পরিবেশ তো এই প্রধানমন্ত্রীই বানিয়েছেন। কর্পোরেট মালিকদের সেবায় তিন কৃষি আইন এনে নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রিত্বেই বিজেপি সরকার চেষ্টা করেছে কৃষকের সর্বনাশ করার। এই

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিষ্ট) ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার কৌতলা লোকাল কমিটির প্রবীণ কমরেড নিতাইচাঁদ সামন্ত দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৮ আগস্ট নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।



ষাটের দশকের শেষ ভাগে যুক্তফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন তৎকালীন দলের নেতা ও মন্ত্রী কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়ে কমরেড নিতাইচাঁদ সামন্ত দলের সাথে যুক্ত হন। তিনি শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী ছিলেন। সেই সময় লোকাল কমিটির সম্পাদক প্রয়াত কমরেড ব্রজেন নাইয়ার সাহচর্যে রাজুখাখি, পাকুড়তলা ও আশেপাশের গ্রামে গরিব খেটে খাওয়া মানুষদের সংগঠিত করার কাজ দায়িত্বের সাথে পালন করেন। এই সংগ্রামের পথে তিনি দলের আবেদনকারী সদস্য হন।

পরবর্তী সময়ে বয়সের ভারে শরীর অশক্ত হয়ে পড়ায় কাজ করতে না পারলেও দলের নিয়মিত চাঁদা, ডোনেশন দিতেন এবং পত্রপত্রিকা বিশেষ করে গণদাবী নিয়মিত পড়তেন ও স্থানীয় কমরেডদের থেকে দলের কাজকর্মের খোঁজ নিতেন। বিভিন্ন বিষয়ে স্থানীয় কর্মীদের অভিভাবকের মতো পরামর্শ দিতেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল দীর্ঘদিনের এক সংগ্রামী সাথীকে।

কমরেড নিতাইচাঁদ সামন্ত লাল সেলাম

প্রধানমন্ত্রীর দিল্লি সীমান্তে সাতশোর বেশি প্রতিবাদী কৃষককে প্রাণ বলিদান করতে বাধ্য করেছেন। দেশের খনি, জ্বালানি তেলের ভাণ্ডার, জলসম্পদ, বনজ সম্পদ, বিমান পরিবহন ইত্যাদি সমস্ত কিছু একচেটিয়া মালিকদের হাতে বেচে দেওয়ার কাজে সবচেয়ে এগিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সময়কাল। কোভিড মহামারির সুযোগে তৈরি ‘পিএম কেয়ার’ তহবিল প্রধানমন্ত্রী কার সেবায় লগিয়েছেন সে সত্য আজ মানুষ জানতে চায়। জানতে চায় নোট বাতিল করে সাধারণ মানুষকে মেরে তাঁর বিশেষ বন্ধুদের বিশেষ সেবার পর এখন কেন নতুন করে ডিজিটাল লেনদেনে কর বসানো প্রধানমন্ত্রী?

নরেন্দ্র মোদি তথা বিজেপি শাসনের দুঃসহ সেবার থেকে মুক্তি চেয়েই গত জুলাই মাসে দিল্লি থেকে শুরু হয়ে সারা ভারতে ফেটে পড়েছে ছাত্র-যুবদের আন্দোলন। সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই আজ সারা দেশের মানুষ প্রতিবাদ করছেন। বিজেপির আইটি সেলের তৈরি নরেন্দ্র মোদির ‘বিশ্বগুরু’ ‘মহামানব’ মূর্তির ফানুস আগেই ফেটে গেছে। তাঁর ভাবমূর্তি আজ দেশ জুড়ে মানুষের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয়। নরেন্দ্র মোদির এই ধিক্কার কুড়ানো ভাবমূর্তি মেরামত করার আশাতেই কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিজেপি সরকার এখন প্রদীপ জ্বালাচ্ছে, সেবা সংকল্প করছে।

মার্ক্সবাদী তত্ত্বকে আয়ত্ত করতে হবে প্রয়োগের উদ্দেশ্য নিয়েই

মাও সে তুঙ



আমাদের অধ্যয়নের ধরনে এখনও কিছু ভুলত্রুটি রয়ে গেছে, পার্টির আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সম্পর্কের ধরনে এবং আমাদের লেখার ধরনের মধ্যেও বেশ কিছু ভুলত্রুটি রয়ে গেছে। অধ্যয়নের ধরনে কিছু কিছু ভুলত্রুটি বলতে আমরা মনগড়া চিন্তাপদ্ধতির ব্যাধির কথাই বোঝাচ্ছি। পার্টির সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি বলতে আমরা সংকীর্ণতাবাদের ব্যাধিকে বোঝাচ্ছি। লেখার ধরনে ভুলত্রুটি বলতে আমরা হুকে বাঁধা লেখার ব্যাধিকে বোঝাচ্ছি। ... শত্রুকে উৎখাত করার কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য পার্টির অভ্যন্তরের এই কর্মরীতিগুলির সংশোধন করার কাজটি আমাদের সুসম্পন্ন করা চাই। অধ্যয়নের রীতি, লেখার রীতিও পার্টির কর্মরীতির অংশ।...

... অনেক মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বই আমরা পড়েছি, কিন্তু আমরা কি দাবি করতে পারি যে আমরা তত্ত্ববিদদের পেয়েছি? পারি না। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে প্রয়োগের ভিত্তিতে মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্ট্যালিনের সৃষ্ট তত্ত্ব, তাঁদের সাধারণ সিদ্ধান্তগুলিতে তাঁরা পৌঁছেছেন ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক বাস্তবতা থেকে। আমরা যদি শুধু তাঁদের রচনাবলিই পড়ি কিন্তু চিনের ইতিহাস ও বিপ্লবের বাস্তবতাকে যদি তাঁদের তত্ত্বের আলোকে অধ্যয়ন করতে অগ্রসর না হই, অথবা আমরা যদি তত্ত্বকে সযত্নে চিনের বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রয়োগের বিষয়টি গভীর ভাবে ভেবে দেখার চেষ্টা না করি, তা হলে নিজেদের মার্ক্সবাদী তত্ত্ববিদ বলে গালভরা নাম না দেওয়াই আমাদের পক্ষে উচিত হবে। যদি চিনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েও আমরা চিনের সমস্যাগুলির প্রতি চোখ বুজে থাকি এবং মার্ক্সবাদী রচনাগুলি থেকে শুধু কিছু বিচ্ছিন্ন

সিদ্ধান্ত ও সূত্র মুখস্থ করি তা হলে তত্ত্বগত ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য নিতান্ত নগণ্য বলে বিবেচিত হবে। একজন লোক যদি শেষ পর্যন্ত শুধু মার্ক্সবাদী অর্থনীতি বা দর্শন মুখস্থ করতে পারেন, প্রথম অধ্যায় থেকে শুরু করে দশম অধ্যায় পর্যন্ত অনায়াসে উদ্ধৃতি দিতে পারেন, কিন্তু তাকে প্রয়োগ করতে একেবারেই অসমর্থ হন, তবে তাঁকে মার্ক্সবাদী তত্ত্ববিদ বলে গণ্য করা যায় কি? না, যায় না। আমরা কী ধরনের তত্ত্ববিদ চাই? আমরা তেমন তত্ত্ববিদই চাই যিনি মার্ক্সবাদ-

লেনিনবাদী অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইতিহাস ও বিপ্লবের গতিপথে যে বাস্তব সমস্যাগুলি দেখা দেবে তাকে সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারবেন, আর চিনের অর্থনীতিগত, রাজনীতিগত, সামরিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য সমস্যাগুলির তত্ত্বগত বিশদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন। এ ধরনের একজন তত্ত্ববিদ হতে গেলে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ, মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গির ও পদ্ধতির মর্মবস্তুর যথার্থ অধিকারী হতে হবে এবং উপনিবেশের বিপ্লব ও চীন বিপ্লব প্রসঙ্গে লেনিন ও স্ট্যালিনের তত্ত্বগুলিকে যথাযথ ভাবে আয়ত্ত করতে হবে এবং তাকে চিনের বাস্তব সমস্যাগুলি সুগভীর ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রয়োগের ব্যাপারে সমর্থ হতে হবে এবং এই সমস্যাবলীর বিকাশের নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করতে পারার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। ঠিক এ ধরনের তত্ত্ববিদদেরই আমাদের যথার্থ প্রয়োজন। ...

আমাদের পার্টি-স্কুলের কমরেডরা মার্ক্সবাদী তত্ত্বকে প্রাণহীন শাস্ত্রবাক্য বলে যেন মনে না করেন। মার্ক্সবাদী তত্ত্বকে আয়ত্ত করতে হবে একমাত্র প্রয়োগের উদ্দেশ্য নিয়েই। আপনি যদি মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে একটি-দুটি বাস্তব সমস্যার বিশদ ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করতে পারেন তবে আপনাকে খানিকটা সাফল্যের কৃতিত্ব ও গৌরব দেওয়া যায়। যত বেশি সমস্যার বিশদ বিশ্লেষণ আপনি করবেন, যত বেশি পূর্ণাঙ্গ ভাবে এবং গভীর ভাবে আপনি তা করবেন, আপনারা সাফল্য ততই বেশি হবে।

‘পার্টির কর্মরীতি সংশোধন করুন’, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২

সুন্দরবনে টাইগার টুরিজম

কার বিপন্নতায় কার উন্নয়ন

সুন্দরবনে এসেছিলেন অভিনেতা ও বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। তিনি ৮-১০টি জনবসতিহীন দ্বীপ চিহ্নিত করে সেখানে ‘টাইগার টুরিজম’-এর নামে পাঁচতারা মানের ট্রি-হাউস বা পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা বলেছেন। তাতে দ্বীপগুলি ৯৯ বছরের জন্য বেসরকারি সংস্থাকে লিজ দেওয়া হবে এবং ৭০-৮০ শতাংশ কর্মী স্থানীয় মানুষদের থেকে নেওয়ার শর্ত থাকবে। ডলফিন দর্শন ও ধর্মীয় পর্যটনের কথাও এ প্রসঙ্গে এসেছে।

এ বিষয়ে সরকারের চূড়ান্ত পরিকল্পনা এখনও আসেনি। কিন্তু এই ঘোষণাই কয়েকটি প্রশ্ন সামনে এনে দিয়েছে।

সুন্দরবন কার? উন্নয়ন কার জন্য? আর সেই উন্নয়নের লাভ কার হাতে যাবে? তার মূল্য কে দেবে? কে হবে উন্নয়নের বলি? কে চাপা পড়বে উন্নয়নের রথের চাকায়?

কারও ঘর ভাঙে, কেউ পাঁচতারা হোটেলের স্বপ্ন দেখে

একদিকে সুন্দরবনের ভাঙা বাঁধ। অন্য দিকে পাঁচতারা পর্যটনের স্বপ্ন। একদিকে নদীর নোনা জল ঢুকিয়ে কৃষকের জমি নষ্ট করবে। অন্য দিকে সেই নদীতেই ডলফিন দেখানোর জন্য পর্যটকের জলযান ছুটবে। একদিকে মাছ ধরতে গিয়ে বিপদে পড়েন জেলে। অন্য দিকে পর্যটকের জন্য নদী হবে ‘অ্যাডভেঞ্চার’। এই বৈপরীত্য ভাবায়।

সুন্দরবনে পর্যটন থাকবে না, কেউ বলে না। পর্যটন মানুষের আয়ের এবং আনন্দের একটি ক্ষেত্র। কিন্তু কী ধরনের পর্যটন, কার নিয়ন্ত্রণে, কার স্বার্থে এবং তার পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্য কত? এ সব ভাবা কি জরুরি নয়?

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে রাজ্যের পর্যটন দফতরের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৫২৫.৯২ কোটি টাকা। এই টাকায় কী উন্নয়ন হবে? এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে কোন বিষয়গুলি?

জনস্বার্থকে গুরুত্ব দিলে প্রথমে বাঁধ, হাসপাতাল, পানীয়

জল, শিক্ষা, যোগাযোগ ও জীবিকা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা জরুরি। এই ন্যূনতম প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি, নাকি পাঁচতারা পর্যটন— সরকারের অগ্রাধিকার কোনটা?

পশু সংরক্ষণ চাই, কিন্তু মানুষকে বাদ দিয়ে কি?

সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষা নিয়ে কোনও আপস হতে পারে না। বাঘ বাঁচাতে হবে, ম্যানগ্রোভ বাঁচাতে হবে, নদী-খাঁড়ি বাঁচাতে হবে। কারণ এর সঙ্গে সামগ্রিক ভাবে পরিবেশ রক্ষার প্রশ্ন জড়িত। সুন্দরবন শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, সমগ্র পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত সম্পদ।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের কোর এলাকা প্রায় ১৭০০ বর্গ কিলোমিটার এবং বাফার এলাকা ৮৮৫ বর্গকিলোমিটারের বেশি।

সম্প্রতি সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের পরিসর আরও বাড়ানোর উদ্যোগও হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই ‘প্রায় ১,৫০০ বর্গকিলোমিটার নতুন কোর এলাকা’ নিয়ে যে আলোচনা ছড়িয়েছে, তার পক্ষে নির্ভরযোগ্য সরকারি বিজ্ঞপ্তি এখনও সামনে নেই। তাই নানা গুজব চলছে। সঠিক তথ্য চাই। কিন্তু আরও বেশি করে চাই একটি নীতিগত উত্তর।

সংরক্ষণ কি মানুষের বিরুদ্ধে হবে, নাকি মানুষকে সঙ্গে নিয়েই হবে? সুন্দরবনের মানুষ পরিবেশ প্রকৃতি রক্ষার গুরুত্ব বোঝেন। তাঁরাই এই প্রকৃতির সঙ্গে শতাব্দীর সম্পর্ক বহন করে চলেছেন। ফলে প্রকৃতিধ্বংসী প্রকল্প তারা মানবেন কেন?

পর্যটন প্রকল্পের পক্ষে সবচেয়ে আকর্ষণীয় যুক্তি, স্থানীয় কর্মসংস্থান। এটিও গভীরে ঢুকে পর্যালোচনা জরুরি। ধরা

যাক, সত্যিই কিছু স্থানীয় মানুষকে চাকরি দেওয়া হল। কিন্তু একজন জেলে যে নিজের নৌকা নিয়ে নদীতে যান, তাঁর জীবিকা যদি পর্যটনের নিয়মে সংকুচিত হয়, তা হলে? একজন মৌয়াল যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বন থেকে মধু সংগ্রহ করেছেন, তাঁর বন-প্রবেশে যদি নিষেধাজ্ঞা জারি হয়? একজন কৃষককে যদি নোনা জল ঢোকানোর পরিণামে জমির বক্ষ্যাত্বের কারণে জমি হারাতে বাধ্য করা হয়? হোটেলের চাকরি কি সেই ক্ষতির সম্পূর্ণ বিকল্প হতে পারে? তা ছাড়া উচ্ছিন্ন এই মানুষগুলিই যে চাকরি পাবে তার গ্যারান্টি কী?

স্বাধীন জীবিকা হারিয়ে মজুরে রূপান্তর

এ নিয়েও নানা আশঙ্কা

বড় পুঁজি এলে শুধু কত টাকা বিনিয়োগ হবে, কত চাকরি হবে, এই হিসাব যথেষ্ট নয়। কার জমি যাবে, কার জীবিকা যাবে, কার হাতে মালিকানা থাকবে,



বাঁধ বাঁচানোর দাবিতে বিক্ষোভ সুন্দরবনের মানুষের। ফাইল চিত্র

আর লাভের কতটা কার কাছে থাকবে। সেই হিসাবও করতে হয়। সুন্দরবনের ক্ষেত্রেও তাই প্রশ্নটি কেবল কর্মসংস্থানের নয়। কর্মসংস্থানের মালিকানা কার? জমির নিয়ন্ত্রণ কার? পর্যটনের মুনাফা কার? বন, নদী ও মানুষের সম্পর্কে শুধু ‘বিকল্প জীবিকা’ দিয়ে মুছে ফেলা যায় না।

মৌ-চাষ বা বাস্কে মধু উৎপাদনের মতো নতুন উদ্যোগ অবশ্যই থাকতে পারে। কিন্তু সেটি যেন এমন ভাবে চাপিয়ে দেওয়া না হয় যাতে বননির্ভর ঐতিহ্যবাহী মৌয়াল ধীরে ধীরে নিজের অধিকার হারান। কারণ প্রশ্নটি মধু

ছয়ের পাতায় দেখুন

রমাবাস্ত্রের সাফল্যের আলোকিত আখ্যান সরকারি ব্যর্থতার আঁধার ঢাকতেই

মহারাস্ত্রের বীড় জেলার নাম শুনলে সবার আগে মনে পড়ে এই খরাপ্রবণ অঞ্চলের আখের খেতে অমানুষিক পরিশ্রম করে দিন গুজরান করা মেয়েদের। প্রবল জলাভাবের মধ্যে ঋতুকালীন অসুস্থতার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আর কাজ চলে যাওয়ার ভয়ে এই জেলার অসংখ্য এমন মেয়ে এমনকি সন্তান আসার আগেও অপারেশন করিয়ে নিজেদের জরায়ু বাদ দিয়ে দেন। এই বীড়েরই অধিবাসী সাতচল্লিশ বছরের বিধবা রমাবাস্ত্র রণবীর সম্প্রতি খবরে এসেছেন একটি দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে।

দুই মেয়ের মা বিধবা রমাবাস্ত্র বাড়ি বাড়ি রান্নার কাজ করে কষ্টে সংসার চালান। জিতলে পুরস্কার মিলবে তিন হাজার টাকা। মেয়ের স্কুলের বেতন দেওয়ার জন্য ওই টাকাটা বড় দরকার ছিল তাঁর। তাই নিজের বয়স, শরীর এ সব নিয়ে ভাবেননি তিনি। ক্ষয়ে যাওয়া চটি আর মলিন শাড়ি পরেই ম্যারাথন দৌড়ের ট্র্যাকে দাঁড়িয়েছেন। কিছুদূর গিয়ে যখন কাদায় পিছলে যাচ্ছে চটি, তখন খালি পায়েই দৌড়েছেন বাকি পথ এবং সবাইকে অবাক করে, অনেক নবীন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে প্রথম হয়েছেন তিনি।

স্বভাবতই মিডিয়ায় রমাবাস্ত্রের এই কাহিনি উঠে আসছে মাতৃত্বের মহিমা হয়ে, যেখানে এক মা প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে জয়ী হয়েছেন এবং সন্তানের পড়াশুনার খরচ জোগাড় করেছেন। তিন-চার হাজার টাকায় রমাবাস্ত্রের মেয়েদের স্কুলের বেতনের কতখানি সুরাহা হবে, বিজয়ী মায়ের এই প্রত্যয়ের হাসি কত দিন অমলিন থাকবে আমরা জানি না। কিছু দিন পর যখন আবার অর্থ-সংকটে পড়বেন, সংসার প্রতিপালন হোক বা মেয়েদের পড়াশুনা বা প্রিয়জনের অসুখে আবারও টাকার ভয়ানক প্রয়োজন হবে তাঁর, তখন কি তিনি আবারও দাঁড়াবেন কোনও ম্যারাথনের লাইনে? জয়ী হতে পারবেন আবারও?

যে দেশের প্রধানমন্ত্রী বারো বছর ধরে ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ নাম দিয়ে প্রকল্প চালু করেছেন, যার বিজ্ঞাপনী জৌলুসে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, সে দেশের বেটিদের বেঁচে থাকা বা পড়াশুনার আসলে কতটুকু সুরাহা হচ্ছে? এমন যে হাজার-হাজার মা উদয়াস্ত খেটেও সন্তানের

পড়াশুনা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন না, নানা কারণে যে মেয়েরা প্রতি বছর হারিয়ে যাচ্ছে শিক্ষার পরিসর থেকে, কে দৌড়াবে তাঁদের হয়ে? যে উপলক্ষে এই ‘অমৃত দৌড়’-এর আয়োজন, তা-ও ওই শিক্ষার নামেই, কোনও একটি নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাফল্য উদযাপনের জন্য। অথচ রমাবাস্ত্রের মেয়েদের মতো দেশের কোটি কোটি সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা নির্ভর করছে যার ওপর, সেই সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে লাটে তোলার আয়োজন চলছে সরকারি উদ্যোগেই।

নীতি আয়োগের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, শুধু বিগত দশকে দেশে বন্ধ হয়ে গেছে ৯৪ হাজার স্কুল, অর্থাৎ গড়ে পঁচিশটি স্কুল উঠে যাচ্ছে রোজ। কোনও মতে টিকে থাকা স্কুলগুলোতে পরিকাঠামো বা শিক্ষক-সংখ্যার হাল কী, এ কথা আর নতুন করে তথ্য দিয়ে বোঝাতে হয় না কাউকে। এই অবস্থায় যখন রমাবাস্ত্র রণবীরের মতো এক খেটেখাওয়া মায়ের বাধ্যতাকে ব্যক্তির সাফল্যের আলোকিত আখ্যান হিসাবে তুলে ধরা হয়, তখন আসলে ঢাকতে চাওয়া হয় এই ব্যবস্থার ভয়ানক বৈষম্য ও অন্ধকারকে, সরকারের ভয়ানক ব্যর্থতাকে।

মনে পড়ে, গত বছর কুস্তমলোর প্রবল ভিড় সামলাতে এক বছরের শিশুপুত্রকে বুকে বেঁধে স্টেশনে ডিউটি করতে এসেছিলেন পুলিশ কনস্টেবল রিনা। তখনও সন্তানের জন্য মায়ের এই কষ্ট শিকার এবং কর্তব্যবোধের ঢালাও প্রশংসা হয়েছিল সংবাদপত্রে, সমাজমাধ্যমে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার সরকারি দায়িত্বে নিযুক্ত একজন মা-কে তার শিশুসন্তানকে নিয়ে এমন ঝুঁকি কেন নিতে হবে, ভবিষ্যতের নাগরিকের সুরক্ষার কোনও দায় রাষ্ট্র-সরকার-প্রশাসন কেন নেবে না, আড়ালে চলে গিয়েছিল এই জরুরি প্রশ্ন। আর আজ যখন প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালন এবং শাসনক্ষমতার বর্ষপূর্তি উদযাপনের জন্য একদিকে লক্ষ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, তখন আর একদিকে আশি বছরের স্বাধীন দেশে তিন হাজার টাকার জন্য রক্ষা, কাদা-কাঁকরে ভরা পথে দৌড়াচ্ছেন রমাবাস্ত্র। তাঁর সাথে দৌড়াচ্ছে দারিদ্র-কর্মহীনতা-অপুষ্টির অন্ধকারে ডুবে থাকা সেই ভারতবর্ষ, যাদের জীবনে প্রতিদিনের বেঁচে থাকাটাই এক অনন্ত দৌড়।

এসআইআর বিরোধী গণকনভেনশন

জয়নগর : এসআইআরে নাম বাদ পড়া নাগরিকদের সমস্যা দ্রুত নিষ্পত্তি করে তাঁদের

করার দাবিতে ২০ সেপ্টেম্বর নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল উত্তি বাজারে। ভোটাধিকার সুরক্ষা



ভোটার তালিকাভুক্ত করা এবং কোনও নাগরিককে সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না করার দাবিতে ১৬ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণায় জয়নগর ২নং ব্লকের ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির আহ্বানে পাঁচ শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে বিডিও দপ্তরের সামনে

গণকনভেনশন হয়। বক্তব্য রাখেন বনমালী পণ্ডা, মাধবী প্রামাণিক, সজল নন্দর প্রমুখ।

কনভেনশন থেকে কুমকুম সরকারকে সভানেত্রী এবং আবু কাহার গাজী, মোশারফ পেয়াদাকে যুগ্ম সম্পাদক, শ্যামল নন্দরকে কোষাধ্যক্ষ করে ২০ জনের কমিটি গঠিত হয়। আনসার সেখের নেতৃত্বে পাঁচজনের প্রতিনিধিদল বিডিওর সঙ্গে দেখা করেন।

উক্তি : অবিলম্বে সমস্ত বৈধ ভোটারের নাম নথিভুক্ত করে তাদের নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত

সমন্বয় সমিতি মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা প্রস্তুতি কমিটির ডাকে প্রায় ৩ শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে কনভেনশনে মূল বক্তা ছিলেন রাজ্যের অন্যতম সংগঠক আয়সানুল হক। সভাপতিত্ব করেন এলাকার প্রাক্তন শিক্ষক আব্দুর রউফ বৈদ্য। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার কর্মী জ্ঞানতোষ প্রামাণিক, জিয়াউল হালদার, সমাজকর্মী



গোরা জমাদার, আইনজীবী সাইদুল ইসলাম, শিক্ষক নূরনবী সরদার প্রমুখ এলাকার বিশিষ্ট মানুষ। কনভেনশন থেকে জিয়াউল হক হালদারকে সম্পাদক ও শিক্ষক নূরনবী সরদারকে সভাপতি করে ৩০ জনের ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতি, মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কমিটি গঠিত হয়।

ব্যাঙ্কে কর্মী ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন

আইডিবিআই ব্যাঙ্কের চন্দননগর ব্রাঞ্চের কন্ট্রোলরুম কর্মী ভোলানাথ তালুকদারকে ভেঙার ডিসিএম অন্যায়ভাবে ছাঁটাই করে।

এর বিরুদ্ধে ১৬ সেপ্টেম্বর ব্রাঞ্চের সামনে



এআইইউটিইউসি অনুমোদিত আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কন্ট্রোলরুম কর্মী ইউনিয়নের পশ্চিমবঙ্গ শাখার

পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। শতাধিক ব্যাঙ্ক কর্মচারী বিক্ষোভে অংশ নেন। দীর্ঘ সময় বিক্ষোভ চলার পর ব্রাঞ্চ হেড প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হন। বৈঠকে ইউনিয়নের

সভাপতি জগন্নাথ রায়মণ্ডল, সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এআইইউটিইউসি-র স্বর্গলি জেলা সম্পাদক তপন দাস। আলোচনায় ঠিক হয়, এ নিয়ে এইচ আর হেড ডিজিএম আগামী সপ্তাহে ইউনিয়নের সঙ্গে জোনাল অফিসে আলোচনায় বসবেন। এর পর বিক্ষোভ প্রত্যাহত হয়। শেষে ব্যাঙ্ক থেকে চন্দননগর স্টেশন পর্যন্ত মিছিল হয়।

টোটো চালকদের বিক্ষোভ

রাজ্য ও জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল বন্ধের সরকারি নির্দেশে বিপাকে পড়েছেন রাজ্যের টোটো চালকেরা। পুলিশের ধরপাকড়, মামলা সহ আইনি ব্যবস্থার আশঙ্কায় তাঁরা অনেকেই রাস্তায় টোটো নিয়ে বেরোতে পাচ্ছেন না। এর ফলে তাঁদের রুজি-রোজগারে যেমন টান পড়েছে, তেমনিই সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ যাত্রীরাও।

সমস্যা সমাধানের দাবিতে ৯ সেপ্টেম্বর নদিয়া জেলার পলাশিপাড়া থানা এলাকার বিভিন্ন গ্রামের টোটো চালকেরা পলাশিপাড়া বিডিওতে

বিক্ষোভ দেখান ও তাঁকে স্মারকলিপি দেন। সারা বাংলা ই-রিকশা (টোটো) চালক ইউনিয়নের দাবি, টোটো চালানোর বৈধ অনুমতি দিতে হবে।



যাদবপুরে বাম ছাত্রসংগঠনগুলির গণকনভেনশন

বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির যৌথ উদ্যোগে বিজেপির আক্রমণের প্রতিবাদে এবং ক্যাম্পাসের গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার রক্ষার দাবিতে ১৬ সেপ্টেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গণকনভেনশন হয়। মূল খসড়া সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সংগঠন

অ্যাবুটা, জুটা এবং গবেষক সংগঠন জেইউআরএসএ, ডিআরএসও-র প্রতিনিধিরা। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন এআইডিএসও, এসএফআই, ডিওয়াইএসএ, এআইএসএ, পিডিএসএফ, ডিএসএফ (আর্টস), নয়া দিশা, আরএসএফ সহ বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

‘হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, ফিরে দেখা’ নিবন্ধটি অনিবার্য কারণে এই সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না

জলবন্দিদের বিডিও অফিস অভিযান

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লকের বহু মৌজাই দু'মাস ধরে জলমগ্ন। জলবন্দি মানুষদের দুর্ভোগ চরমে। অবিলম্বে জমা জল নিষ্কাশন, স্থায়ী জলনিকাশি সমস্যা সমাধানের দাবি সহ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে কৃষক সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তিন শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন কৃষক সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, গোবিন্দ পড়িয়া ও খড়িচক বেসিন সংস্কার কমিটির সম্পাদক আনন্দবরণ হাভা, মিন্টু প্রামাণিক প্রমুখ। আন্দোলনের চাপে প্রশাসন একটু নড়েচড়ে বসে। পরদিন সকালে বিডিও ও সেচ দপ্তরের এসডিও জলবন্দি এলাকা পরিদর্শন করে দ্রুত জল নিষ্কাশনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন।



জলমগ্ন চণ্ডীপুরে চিকিৎসা শিবির

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির সহযোগিতায় জাগো নারী জাগো বহিঃশিখা (চণ্ডীপুর শাখা)-র উদ্যোগে ১৪



সেপ্টেম্বর জলমগ্ন চণ্ডীপুর ব্লকের অসুস্থ দরিদ্র শত শত শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির হয়। মগরাজপুর বিদ্যাসাগর কেজি

স্কুলে এই শিবিরে চণ্ডীপুরের অভিজ্ঞ জেনারেল ফিজিশিয়ান সুরপতি প্রধান, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সম্পাদক শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভবানী শঙ্কর দাস, চণ্ডীপুর মান্টি স্পেশালিটি হাসপাতালের ডাঃ বুদ্ধদেব বেরা প্রমুখ দুই শতাধিক রোগীর চিকিৎসা করেন। এ ছাড়াও ডাক্তার নরম্যান বেথুন মেমোরিয়াল ট্রাস্ট পরিচালিত পপুলার নার্সিংহোম এবং চণ্ডীপুর সিএমএস হাসপাতালের ইসিজি সেন্টারের টেকনিশিয়ানরা যোগ দেন। এ ছাড়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক স্বপন আচার্য রোগী দেখেন।

পঞ্চগনন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপি দুষ্কৃতিদের হামলা

কোচবিহারে পঞ্চগনন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং এআইডিএসও কর্মীদের উপর এবিভিপি আশ্রিত দুষ্কৃতিদের বর্বর হামলার তীব্র নিন্দা করে কোচবিহার শহরে ১৭ সেপ্টেম্বর বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে ঘটনার সাথে যুক্ত দুষ্কৃতিদের অবিলম্বে কঠোর শাস্তি এবং ক্যাম্পাসে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ও গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনার দাবিতে ধিক্কার মিছিল হয়। নেতৃত্ব দেন এআইডিএসও কোচবিহার জেলা সম্পাদক আসিফ আলম, সভাপতি কৃষ্ণ বসাক ও এসএফআই জেলা সভাপতি জিৎ কুমার পাল প্রমুখ। নেতৃত্ব দান জানান, ১৬ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বাসুদেব রায়কে এবিভিপি ছাত্রা নির্মম ভাবে মারধর করে। অভিযোগ জানাতে গেলে উপাচার্য ও অধ্যাপকদের উপস্থিতিতেই এআইডিএসও-কর্মী সহ ছাত্রছাত্রীদের ওপর হামলা চালায় এবিভিপি দুষ্কৃতিরা। আহতদের হাসপাতালে পাঠানোর সময়ে অ্যাম্বুলেন্সের দরজা ভেঙে এআইডিএসও-র বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট সম্পাদিকা মুক্তা রায় সহ অন্যদের উপর নৃশংস হামলা এবং ছাত্রীদের সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করে তারা। ঘটনার ভিডিও তোলায় ছাত্রছাত্রীদের মোবাইল কেড়ে

নেওয়া ও হুমকির ঘটনা ক্যাম্পাসে চরম নৈরাজ্য ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে। তাঁরা বলেন, গত ১৫ সেপ্টেম্বর এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে মহান মানবতাবাদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সার্থশত জন্মবার্ষিকী উদযাপনের সাফল্যে ক্ষিপ্ত হয়েই এই পরিকল্পিত হামলা। এর আগে এবিএন শীল কলেজ হোস্টেল, মেখলিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে তাণ্ডব চালায় এবিভিপি। পুণ্ডিবাড়ি ও মাথাভাঙায় এসএফআই-এর সম্মেলন চলার সময়ে এবিভিপি-বিজেপি-আরএসএস দুষ্কৃতিরা তাণ্ডব চালিয়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বর মেখলিগঞ্জ কলেজের ছাত্র পবিত্র রায়কে ইউনিয়ন রুমে নিয়ে গিয়ে ব্যাপক মারধর করেছে এবিভিপি দুষ্কৃতিরা। কয়েক দিন আগে তার ব্যাগ থেকে মনীষীদের জীবনী সহ নানা বইপত্র কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। নেতৃত্ব দান জানান, রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পেশিশক্তির সাহায্যে একচ্ছত্র আধিপত্য কয়েমের এই অপচেষ্টা বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতির পরিপন্থী। শিক্ষার অধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষার দাবিতে সোচ্চার হলেই ‘দেশদ্রোহী’ তকমা দেওয়ার হীন চক্রান্ত বাংলার মানুষ ও ছাত্রসমাজ কোনও ভাবেই বরদাস্ত করবে না।

শোক সংবাদ

দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পূর্বতন সদস্য ও নদিয়া জেলার পূর্বতন সম্পাদক কমরেড সুজিত ভট্টশালী ১৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও ব্যাঙ্কের অস্থায়ী কর্মীদের ন্যূনতম মজুরি মিলছে না

অন্যান্য সংগঠিত শিল্পের মতো ব্যাঙ্ক শিল্পেও আজ কন্ট্রাক্ট ও ক্যাজুয়াল কর্মীদের মতো অস্থায়ী কর্মীদের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমছে ব্যাঙ্কের স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা। এক সময় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলিতে স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষের উপর। তখন ব্যাঙ্কে কাজের বোঝা যা ছিল বর্তমানে কাজ তার কয়েক গুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও কর্মীসংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৭ লক্ষ ৫৮ হাজারে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ—স্থায়ী কাজে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করতে হবে। অথচ সরকার নিজেই এই নির্দেশ মানছে না। বিপরীতে ভারত সরকার তথা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অধীনস্থ সারা দেশের সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে স্থায়ী কাজে অস্থায়ী কর্মী কে কত বেশি নিয়োগ করতে পারে তার এক অঘোষিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সম কাজে সম বেতনের নীতিও এখানে মানা হয় না। শোষণ বঞ্চনা এত তীব্র যে সরকার ঘোষিত ন্যূনতম বেতন যা বাজারদরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ৬ মাস অন্তর পরিবর্তিত হয়, যা আবার শ্রমের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে যথেষ্ট কম, তাও দেওয়া হয় না ওই সব অস্থায়ী কর্মীদের। এঁদের অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত এবং ব্যাঙ্কের বহুবিধ কাজের উপযুক্ত। সে কারণে তাঁদের অনেককে সুনির্দিষ্ট কাজের বাইরেও কিছু কাজ করতে বাধ্য করা হয়। সেই কাজ না করলে বিভিন্ন অজুহাতে ছাঁটাই করা হয়। কর্তৃপক্ষের দেওয়া উক্ত কাজ করতে নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে ওভারটাইম পেমেন্ট অনেককে দেওয়া হয় না।

ন্যূনতম বেতনের কথা উঠলে বলা হয় রাজ্য সরকার নির্ধারিত বেতন তাঁদের দেওয়া হচ্ছে। হিসাব কষে দেখা যায় সেটাও পান না অনেকে। কারণ, এঁদের বেশিরভাগকে ব্যাঙ্ক সরাসরি নিয়োগ করে না। ব্যাঙ্ক নিযুক্ত ভেভার বা ঠিকাদারদের দ্বারা এঁরা নিযুক্ত হন। সেখানেও নানা বেনিয়মের অভিযোগ মেলে অহরহ। প্রধান নিয়োগকর্তা ব্যাঙ্ক ভেভারদের কাজকর্ম খতিয়ে দেখলে এমনটা হওয়ার কথা নয়। তা তাঁরা সবসময় ঠিকমতো দেখেন না। যদি দেখা হত, তবে এই সমস্ত কর্মীদের কমপক্ষে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত ন্যূনতম বেতন যা রাজ্য সরকার নির্ধারিত বেতনের চেয়ে বহু ক্ষেত্রে বেশি, তা দিতে ভেভাররা বাধ্য থাকত। বাধ্য থাকত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বেতন দিতে। এ ব্যাপারে আইন হ'ল, কোনও মাসের বেতন দিতে হবে তার পরের মাসের ৭ তারিখের মধ্যে। ভেভার দিতে ব্যর্থ হলে তা দিতে হবে নিয়োগকর্তাকে। তা অনুসৃত হচ্ছে

না। মূল নিয়োগকর্তা সতর্ক থাকলে ভেভার বাধ্য থাকত ছুটি, নির্দিষ্ট পোশাক বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিতে। গ্র্যাচুইটি, বোনাস, লিভ-পে, ওভার টাইম পেমেন্ট, সময়ে পিএফ-এর টাকা জমা করা দিনে দিনে বিলম্বিত কিংবা অধরা হয়ে যাচ্ছে নজরদারির অভাবে। স্থায়ী কাজে নিযুক্ত অস্থায়ী কর্মীদের সময়ে সময়ে স্থায়ীকরণও সুপ্রিম কোর্টের আর এক নির্দেশ। সেখানেও ব্যাঙ্কের সর্বোচ্চ পরিচালকরা উদাসীন। তাঁরা ব্যাঙ্কের লাভের অঙ্ক বাড়াতে ব্যস্ত। লাভের অঙ্ক বাড়ানোর লক্ষ্যে আমানতের উপর সুদের হার কমানো হয়েছে, পরিসেবা শুষ্কের ক্ষেত্র এবং পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে, সেভিংস অ্যাকাউন্টের একটা মোটা অংশকে কারেন্ট অ্যাকাউন্টেরূপান্তরিত করা হচ্ছে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ঋণে সুদের হার বাড়ানো হয়েছে। তারা জানে স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা বাড়লে অতি মুনাফার লক্ষ্য ব্যাপক ভাবে মার খাবে। সে কারণেই স্থায়ী কর্মী সংকোচন প্রক্রিয়া অব্যাহত। সেই লাভের টাকা যে ঘুরপথে এ দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ঘরে ঢুকছে তা নিয়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কোনও উদ্বেগ নেই। প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ তথা জি গ্রুপের কর্ণধার সুভাষচন্দ্রের ২২ হাজার কোটির ঋণ মকুব মাত্র ৬.৫ কোটিতে। এমনি অবাধে বহু বড় বড় বকেয়া ব্যাঙ্ক ঋণ নানা অছিলায় মকুব করে দেওয়া হচ্ছে বৃহৎ পুঁজির মালিকদের। বস্তুত সরকারের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে, মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের সম্পদ আরও স্ফীত করতেই ব্যাঙ্কের এ হেন পরিকল্পনা, এমন উদ্যোগ। এর ফলে দেশের আর্থিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে। মার খাচ্ছে অস্থায়ী ব্যাঙ্ককর্মী, গ্রাহক সহ সাধারণ মানুষ।

শ্রমিক-কর্মচারীদের এ ভাবে নানা কায়দায় বঞ্চনা করেছে ব্যাঙ্ক মুনাফার পাহাড় দীর্ঘতর করেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার লক্ষ্য সর্বোচ্চ মুনাফা। সেই লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থায় শ্রমিক কর্মচারীদের যত বেশি সম্ভব শোষণ করা হয়। শোষণের নানা প্রক্রিয়া কর্তারা আবিষ্কার করে। এই দিকটি সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করতে হবে। এই শোষণের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ককর্তারা হলেন কার্যকরী ম্যানেজার। এই শোষণ ব্যবস্থা যতদিন থাকবে শ্রমিক বঞ্চনা আরও বহুমুখী পথ নেবে। এর বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ককর্মীদের সজাগ হতে হবে, গড়ে তুলতে হবে ন্যায়সঙ্গত ও শক্তিশালী আন্দোলন। গ্রাহক সহ বিভিন্ন অংশের শ্রমজীবী মানুষকে যুক্ত করে ঐক্যবদ্ধ ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনই পারে এই সমস্যা সমাধানের রাস্তা দেখাতে।

জাতীয় শিক্ষানীতির ছয় বছর স্কুলশিক্ষায় প্রাপ্তির ভাঙার শূন্য

ছ'বছর আগে ২৯ জুলাই জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ কার্যকর হয়েছিল। স্কুল শিক্ষার আমূল পরিবর্তন ঘটানোর কথা বলে। ১০+২-র পরিবর্তে ৫+৩+৩+৪ ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। অনেক গালভরা যুক্তি সাজিয়ে বলা হয়েছিল, 'শিশুদের মস্তিষ্কের ক্রমবিকাশের ৮৫ শতাংশই ঘটে ৬ বছরের আগে' (জাতীয় শিক্ষানীতি, প্যারা ১.১)। তাই ৩-৬ বছর সময়ে 'মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ও সুস্থ বিকাশের জন্য প্রাক শৈশব যত্ন ও শিক্ষা'-র পক্ষে জোরালো সওয়াল করা হয়েছিল। প্রথম ৫ বছর 'ভিত্তিস্তর'— যার প্রথম ৩ বছর হল প্রাক-প্রাথমিক ও পরের ২ বছর প্রাথমিক স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি। প্রাক-প্রাথমিকের পরিকল্পনা বহুবিধ— 'বর্ণ, ভাষা, যোগ, বিয়োগ, বিভিন্ন রঙ, আকারের ধারণা, ইনডোর ও আউটডোর খেলা, যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তা, সমস্যা সমাধান, অঙ্কন, চিত্র এবং অন্যান্য ভিসুয়াল আর্ট, নাটক, পুতুল নাচ, গান প্রভৃতি উপাদান থাকবে এই শিক্ষায়' (ওই, প্যারা ১.২)।

৬ বছর বয়সের আগে শিশুকে বাধ্যতামূলক ভাবে স্কুলে ভর্তির প্রস্তাব বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। তার ভাল বা খারাপ দিক নিয়ে আলোচনা চলতে পারে। কিন্তু গোল বেধেছে অন্য জায়গায়। প্রাক-শৈশবের জন্য সরকারি কোনও স্কুল নেই। বিকল্প হিসাবে সুপারিশ করা হয়েছে অঙ্গ নওয়াড়ি কেন্দ্র। কিন্তু এই কেন্দ্রগুলি স্কুল নয় এবং শিক্ষা দফতরের অধীনেও নয়। এগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরের পরিচালনায় ৬ বছরের নিচের শিশু, প্রসূতি মায়েদের সুখম খাদ্য প্রদানের কেন্দ্র। এর কর্মী ও সহায়িকাদের শিক্ষাদানের কোনও প্রশিক্ষণ নেই। কেন্দ্রগুলির দূরবস্থার কথা অবদিত নয়— কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রধানত ভাঙা বাড়ি, ফুটো ছাদ ও অস্বাস্থ্যকর খাবার। এমন দুর্বল পরিকাঠামোয় কর্মী ও সহায়িকারা ইনডোর ও আউটডোর খেলা, অঙ্কন, চিত্র, ভিসুয়াল আর্ট, নাটক, পুতুল নাচ ইত্যাদির ব্যবস্থা করবেন কী করে?

শিক্ষানীতির বয়ানে আছে, "(ক) স্বতন্ত্র অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, (খ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, (গ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় (অন্তত ৫-৬ বছর বয়সের শিশুদের জন্য), (ঘ) স্বতন্ত্র প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়" প্রভৃতি গড়ে তোলা হবে (ওই, প্যারা ১.৪)। গত ৬ বছরে এমন একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সারা দেশের কোথাও কি গড়ে উঠেছে? প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কী বলা হয়েছে? 'এই সমস্ত বিদ্যালয়ে নিযুক্ত কর্মী ও সহায়িকারা প্রাক শৈশব যত্ন ও শিক্ষার শিখন পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রমের উপর বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবেন' (ওই, প্যারা ১.৪)। তাঁদের জন্য দুই স্তরের অনলাইন প্রশিক্ষণের সুপারিশ ছিল। কিন্তু এই প্রশিক্ষণ গত ছয় বছরে হল কোথায়? তা হলে তাঁদের ভাষা অনুযায়ী 'শিশু মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ও সুস্থ বিকাশের' কারিগর কারা হবেন? অপুষ্টিতে ভুগলে শিশু "সন্তোষজনক শিক্ষা লাভ করতে পারে না"— শিক্ষানীতিতে এমন কথা উল্লেখ করে "মিড ডে মিলের পাশাপাশি পুষ্টিবর্ধক প্রাতরাশের" প্রস্তাব ছিল, লোভনীয় খাদ্যতালিকারও বিধান ছিল। কী নির্ভুর পরিহাস! প্রাতরাশ দূর অস্ত, স্কুলের মিড ডে মিলে ডিম জুটেবে কি না তা নিয়েও এই রাজ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় প্রতিবাদ হয় এবং অনেক গড়িমসির পর বাধ্য হয়ে সরকার ডিমের আলাদা ব্যবস্থা করেছে।

স্কুলছুট এ দেশে একটি জটিল সমস্যা। উদ্ভিন্ন শিক্ষানীতি প্রণেতারা সমাধানের উপায় বাতলেছিলেন— যারা 'ড্রপআউট' হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে ড্রপআউট হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাদের জন্য দু'ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। প্রথমটি হচ্ছে প্রাথমিক স্তর থেকে দ্বাদশ মান পর্যন্ত প্রতিটি বিদ্যালয়ের সঠিক পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করা, যেখানে প্রতিটি শিশু সুরক্ষিত ও আকর্ষণীয় পরিবেশ পায়'। 'সুরক্ষিত ও আকর্ষণীয়' পরিকাঠামোর উদাহরণ কেমন? কিছু দিন আগে বিজেপি শাসিত রাজস্থানে একটি স্কুলের ছাদ ভেঙে ৭ ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছে ২৮ জন। ওই ঘটনার পর সরকার নড়েচড়ে বসে ৬৩ হাজার স্কুলের পরিকাঠামোর উপর একটা সমীক্ষা করে যে রিপোর্ট দেয় তাতে চক্ষু চড়কগাছ— ৮৬ হাজার ৯৩৪টি শ্রেণিকক্ষ বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। একটি বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যম

গত বর্ষায় দেখিয়েছিল বিহারের বহু স্কুলের ঠিকানা 'পেড় কে নিচে'। এই বর্ষায় হরিণঘাটার একটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল জল থে থে অবস্থার জন্য কয়েকদিন বন্ধ রয়েছে।

কিন্তু স্কুল-ছুট বন্ধের এত পরিকল্পনা সত্ত্বেও ছবিটা কি পাল্টেছে? সংসদের গত শীতকালীন অধিবেশনের প্রস্তাবের পর্বে ভয়ানক তথ্য উঠে এসেছে। নারী ও শিশু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রীর উত্তর থেকে জানা যায়, গত পাঁচ বছরে দেশে ৬৫.৭ লক্ষ শিশু স্কুল ছেড়েছে, যার প্রায় অর্ধেক ২৯.৮ লক্ষ হল কিশোরী। রাজ্যভিত্তিক তথ্য বলছে, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে গুজরাটে প্রায় ২.৪ লক্ষ শিশু স্কুলছুট হয়েছে যা দেশে সর্বাধিক। এর মধ্যে ১.১ লক্ষ কন্যা শিশু। ২০২৪ সালে সেখানে স্কুলছুট শিশুর সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৪,৫৪১ জন, অর্থাৎ এক বছরে এই বৃদ্ধি ৩৪০ শতাংশেরও বেশি। গুজরাটের মতো 'হাই প্রোফাইল' রাজ্যে হঠাৎ করে এই বিপুল বৃদ্ধি সকলকে বিস্মিত করেছে। এর পরেই রয়েছে আসাম, যেখানে মোট দেড় লক্ষাধিক শিশু শিক্ষাঙ্গনের বাইরে চলে গেছে, যার মধ্যে ৫৭,৪০৯ জন মেয়ে। উত্তরপ্রদেশে স্কুলছুট শিশুর সংখ্যা ৯৯,২১৮, যার মধ্যে ৫৬,৪৬২ জন কিশোরী। অথচ শিক্ষানীতিতে লক্ষ্য বেঁধে দেওয়া হয়েছিল— "মেয়েদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে বেশি নজর দিতে হবে যাতে তারা বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে না ফেলে"। নীতি আয়োগের সাম্প্রতিকতম রিপোর্ট বলছে— 'প্রাথমিকে স্কুলছুটের হার ০.৩ শতাংশ হলেও, মাধ্যমিক স্তরে পৌঁছেতেই এক লাফে তা ১১.৫ শতাংশে ছুঁয়েছে'। পরিসংখ্যানগুলি কি যথেষ্ট উদ্বেগজনক নয়?

শিক্ষানীতিতে প্রতিশ্রুতি ছিল— 'সরকারি বিদ্যালয়গুলির গ্রহণযোগ্যতা পুনরুজ্জীবিত করা হবে বর্তমান বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন ও আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে'। বাস্তব কিন্তু উল্টো কথা বলছে। একটা ধারণা সুপরিকল্পিত ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে— সরকারি স্কুলের পরিকাঠামোর হাঁড়ির হাল, পঠন-পাঠনের পরিবেশের অভাব এবং সর্বোপরি শিক্ষক নেই। আসাম বিধানসভায় রাজ্য সরকার জানিয়েছে, 'স্কুলগুলোতে ৬০,০৩২টি শিক্ষকপদ শূন্য এবং ৭,৯৪৮টি স্কুলে নির্ধারিত ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত নেই'। পশ্চিমবঙ্গে র অবস্থাটা কী? ২০২৩ সালে পূর্বতন শিক্ষামন্ত্রী বিধানভায় বলেছিলেন, প্রাথমিকে শূন্যপদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৯ হাজার, যার পরে বাস্তবে কোনও নিয়োগ হয়নি। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এই সংখ্যা ৬০ হাজারেরও বেশি। শূন্য শিক্ষক পদ সম্পর্কিত অবস্থাটি সব রাজ্যেই সমান। অথচ ছয় বছর আগে জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছিল— "অতি সত্ত্বর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষক শূন্যতা বা স্বল্পতা দূর করা হবে" (প্যারা ২.৩)। কিন্তু হায়! ছয় বছর পেরিয়ে গেলেও 'অতি সত্ত্বর' সময়টি আজও এল না! ফলে নিম্নবিত্ত পরিবারের অভিভাবকরাও পকেট খালি করে ছুটছেন বেসরকারি স্কুলের দরজায়। ফলে সরকারি স্কুলে ছাত্র কমছে, কিছু দিন পর স্কুলগুলিই বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, অথবা দূরের কোনও স্কুলের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ রাজ্যে ৮,২০৭টি সরকারি স্কুল বন্ধ হয়েছে। নীতি আয়োগ বলছে, 'গত এক দশকে দৈনিক গড়ে ২৫টি করে স্কুল বন্ধ হয়েছে'। '২০১৪-১৫ সালে দেশের ১১.০৭ লক্ষ সরকারি স্কুল ২০২৪-২৫ সালে কমে হয়েছে ১০.১৩ লক্ষ। সরকারি স্কুলে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা প্রায় ২.২৬ কোটি কমেছে'। উল্টো দিকে বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা "২.৮৮ লক্ষ থেকে বেড়ে ৩.৩৯ লক্ষ হয়েছে"। ফলে অভিভাবকদের শিক্ষার জন্য চড়া মূল্য গুনতে হচ্ছে। এ সবই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের শিক্ষানীতির পরিণাম।

অথচ শিক্ষানীতির ছত্রে-ছত্রে 'মিশন', 'গোল', 'টাগেট' শব্দগুলো ব্যবহার হয়েছিল। জাতীয় শিক্ষানীতিকে গ্রহণীয় করার জন্য যে ওই শব্দবন্ধগুলি প্রয়োগ হয়েছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ওই শিক্ষানীতি যে সরকার পোষিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে শিক্ষার বেসরকারিকরণের রাস্তাকে মসৃণ করেছে তা আজ আমাদের কাছে জলের মতো পরিষ্কার। ছয় বছরের মাথায় এটাও পরিষ্কার, জাতীয় শিক্ষানীতির বয়ানটি ছিল মানুষকে বিভ্রান্ত করার একটি পরিকল্পিত যড়যন্ত্র।

সুন্দরবনে টাইগার টুরিজম

তিনের পাতার পর

উৎপাদনের পদ্ধতি নিয়ে নয়। প্রশ্নটি হল, মানুষের নিজের জীবিকা বেছে নেওয়ার অধিকার থাকবে কি না।

সুন্দরবন কি মুনাফার নতুন মানচিত্র?

সুন্দরবনকে বড় পর্যটন বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে দেখার ইতিহাস নতুন নয়। ২০০১ সালে সাহারা ইন্ডিয়া সুন্দরবনের দ্বীপে পর্যটন রিসর্ট তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছিল। এর বিরুদ্ধে লড়াই করে দ্বীপবাসী সরকারি সিদ্ধান্তের বদল ঘটিয়েছিল। আজ আবার ৯৯ বছরের লিজ, বেসরকারি বিনিয়োগ, পাঁচতারা রিসর্ট, ডলফিন পর্যটন, ধর্মীয় পর্যটন— সব মিলিয়ে নতুন এক পর্যটন অর্থনীতির সম্ভাবনার কথা তুলে ধরা হচ্ছে। এখানে সতর্ক হওয়ার কারণ আছে।

পুঁজির চোখে নদী হতে পারে মুনাফার জলপথ, বন হতে পারে পর্যটন সম্পদ, দ্বীপ হতে পারে বিনিয়োগের জমি, আর বাঘ হতে পারে পর্যটকের আকর্ষণ। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের কাছে নদী বেঁচে থাকার অন্ন। বন তাদের জীবিকা। জমি তাদের জীবন। সুন্দরবন আবাসস্থল। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাতটা বিপরীত শ্রেণি স্বার্থের।

বনবিবির দেশে বিভেদের রাজনীতি নয়

সুন্দরবনের মানুষের সংস্কৃতির গভীরে বনবিবি ও দক্ষিণ রায়কে ঘিরে হিন্দু-মুসলমানের দীর্ঘ সহাবস্থান রয়েছে। জেলে, মৌয়াল, বাওয়ালির কাছে বনের বিপদ ধর্মের দেওয়াল মানে না। তাই ধর্মীয় পর্যটনের নামে যদি এই ঐতিহ্যকে বাণিজ্যিক প্রদর্শনীতে পরিণত করা হয় কিংবা ধর্মীয় মেরুকরণের ক্ষেত্র তৈরি হয়, তা হলে তার ক্ষতি সংস্কৃতির, ক্ষতি মানুষের একের। যে একা নিয়ে জেলে নদীতে যায়, যে একাবদ্ধ প্রচেষ্টায় মানুষ বাঁধ রক্ষা করে, যে একা নিয়ে বিপদের দিনে একে অন্যের পাশে দাঁড়ায়, সেই একাই সুন্দরবনের শ্রমজীবী মানুষের শক্তি। সেই একা ভাঙতে দেওয়া চলে না। উন্নয়নটা এমন হোক যেখানে বাঘও বাঁচবে, মানুষও বাঁচবে। 'বাঘ বনাম মানুষ'-এর মিথ্যা দ্বন্দ্ব কাঙ্ক্ষিত নয়। উন্নয়নের ধারণা যথাযথ হওয়া দরকার।

উন্নয়ন মানে শুধু পাঁচতারা হোটেল নয়। উন্নয়ন মানে ভাঙা বাঁধ মেরামত। দ্বীপে হাসপাতাল নির্মাণ। নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ। কৃষকের জমি রক্ষা করা। জেলে-মৌয়ালের জীবিকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।

সুন্দরবনের বিপন্নতায় পরিবেশ সচেতন মানুষের দাবি— সুন্দরবনে কোনও বড় পর্যটন প্রকল্পের আগে পূর্ণ পরিবেশগত ও সামাজিক সমীক্ষা করতে হবে, স্থানীয় জেলে, মৌয়াল, কৃষক, শ্রমিক, পরিবেশবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মতামত ছাড়া কোনও প্রকল্প নয়, সংরক্ষণের নামে ঐতিহ্যবাহী জীবিকা ধ্বংস করা চলবে না, মানুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থানের ভিত্তিতে উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে, পাঁচতারা পর্যটনের আগে সুন্দরবনের বাঁধ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল, যোগাযোগ ও জীবিকার নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, ৯৯ বছরের লিজ বা বেসরকারি বিনিয়োগের কোনও প্রস্তাব থাকলে তার সমস্ত শর্ত জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের অধিকার খর্ব করা চলবে না।

সুন্দরবন কোনও 'প্রকল্প এলাকা' নয়। কোনও 'বিনিয়োগের সুযোগ' নয়। কোনও পাঁচতারা হোটেলের পেছনের দৃশ্যও নয়। সুন্দরবন মানে, নদীর সঙ্গে লড়াই করা মানুষ, বাঘের ভয়কে সঙ্গে নিয়ে বনে যাওয়া মৌয়াল, ঝড়ের রাতে বাঁধ আঁকড়ে থাকা পরিবার, নোনা মাটিতে ফসল ফলানোর চেষ্টা, আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এক কঠিন সহাবস্থান।

তাই আজ প্রশ্ন তুলতেই হবে, সুন্দরবন কার? যে মানুষের ঘাম এই মাটিতে মিশে আছে, যে মানুষের চোখের জলে এই নদী নোনা হয়েছে, যে মানুষের জীবন এই বন-নদীর সঙ্গে বাঁধা সুন্দরবনের উন্নয়নে প্রথম অধিকার তাঁদের। মুনাফার জন্য সুন্দরবন নয়। মানুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থানের সুন্দরবন চাই। বাঘ বাঁচুক, বন বাঁচুক, নদী বাঁচুক, সুন্দরবনের মানুষও বাঁচুক। নিজের অধিকার নিয়ে, নিজের মাটিতে, মাথা উঁচু করে। কারণ সুন্দরবনের লড়াই শুধু পরিবেশের লড়াই নয়। এ লড়াই জীবন-জীবিকার লড়াই।

পরানীন ভারতে মুক্তিসংগ্রামীদের কাছে লেনিন ছিলেন ধ্রুবতারা

একের পাতার পর

ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে মানবতার শত্রু ফ্যাসিস্টরা। আসলে সেই মার্ক্স-এঙ্গেলসের কমিউনিস্ট ইস্তাহারের প্রথম লাইনের মতোই, পুঁজিবাদ একমাত্র ভয় পায়, ভয় পাচ্ছে কমিউনিজমকে। তাই ওরা যত মূর্তি ভাঙবে, তত রুখে দাঁড়ানো এবং ভারত তথা বিশ্বের মানবমুক্তির ইতিহাসে লেনিন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অবদান স্মরণ করিয়ে দেওয়া গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সন্ধীর্ণ রাজনীতির স্বার্থে বিজেপি এবং সংঘ পরিবার আজ দেশের প্রকৃত ইতিহাস মুছে ফেলার এক ন্যাকারজনক চক্রান্ত চালাচ্ছে। নবজাগরণের মনীষী থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামী— একের পর এক মহামানবের অবমাননা আজ গেরুয়া শিবিরের দৈনন্দিন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি যাদবপুরে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা লেনিনের মূর্তিকে কেন্দ্র করে তারা যেনগ্ন গুন্ডামি ও তাণ্ডব চালান, তা নিছক কোনও ভাস্কর্য অবমাননা নয়, এ হল এক অমোঘ আদর্শকে ভয় পাওয়ার বহিঃপ্রকাশ। এর মধ্য দিয়ে এক ধরনের মতাদর্শগত অসহিষ্ণুতা এবং সংকীর্ণতা প্রকাশ পায়। ‘লেনিন বিদেশি, ভারত গঠনে তাঁর কোনও অবদান নেই’ মূর্তি ভাঙার সপক্ষে তাদের তুলে ধরা এই যুক্তিটি যেমন হাস্যকর, তেমনিই তা ইতিহাস সম্পর্কে তাদের চরম অজ্ঞতার পরিচায়ক।

আদর্শের কোনও কাঁটাতার হয় না

মূর্তি স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য সমাজ ও সভ্যতার কল্যাণে মহাপুরুষদের অবদান ও জীবন সংগ্রামকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাঁদের আদর্শে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করা। যাঁদের চিন্তাভাবনা মানবজাতির কল্যাণে নিবেদিত, তাঁদের অবদান কোনও নির্দিষ্ট দেশের মানচিত্রে আটকে থাকে না। তা ভৌগোলিক গণ্ডি পেরিয়ে সমগ্র মানবজাতির সম্পদে পরিণত হয়।

তাই বিদেশের মাটিতে যেমন রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধীর মতো বিশিষ্ট ভারতীয়দের ভাস্কর্য আছে। ঠিক একই ভাবে আমাদের দেশেও শেক্সপিয়ার, ডেভিড হেয়ার বা টলস্টয়ের মূর্তি আছে। বিদেশি হয়েও নেলসন ম্যান্ডেলা ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান ‘ভারতরত্ন’-এ (১৯৯০) ভূষিত হয়েছেন। মানবাধিকার বা সাহিত্যের প্রতীক হিসেবে বিদেশে যেমন ভারতীয়দের সম্মান জানানো হয়, ঠিক একই ভাবে সমাজতন্ত্র ও শোষিত মানুষের অধিকারের বিশ্বজোড়া প্রতীক হিসেবে মহান লেনিনকে এ দেশে সম্মান জানানো হয়। মহৎ আদর্শের এই আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানই সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অলংকার।

পরানীন ভারতের মুক্তিসংগ্রাম ও লেনিন বিপ্লবীদের ধ্রুবতারা

‘ভারতের ইতিহাসে লেনিনের কোনও স্থান নেই’— এ কথা তাঁরাই বলছেন যাদের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কোনও অবদান নেই। ১৯০৮ সালে বাল গঙ্গাধর তিলকের গ্রোপ্তারের প্রতিবাদে মুম্বাইয়ের শ্রমিক আন্দোলনকে

সমর্থন জানিয়েছিলেন লেনিন। লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গভীর প্রেরণা জুগিয়েছিল, যার উল্লেখ ব্রিটিশ দলিলেও রয়েছে। ভারতের স্বাধীনতাকামী নেতারা লেনিন ও সোভিয়েত রাষ্ট্রকে নিজেদের স্বাভাবিক মিত্র হিসেবে বিবেচনা করতেন। ১৯১৭ সালে হোমরুল কমিটির ‘রাশিয়ার উদাহরণ’ পত্রিকা এবং কংগ্রেস অধিবেশনে অ্যানি বেসান্তের বক্তব্যে ভারতে এই বিপ্লবের যুগান্তকারী প্রভাব ও তাৎপর্যের কথা তুলে ধরা হয়। অ্যানি বেসান্ত বলেছিলেন, ‘রুশ বিপ্লব এবং ইউরোপ ও এশিয়ায় রুশ প্রজাতন্ত্রের সম্ভাব্য উন্মেষ ভারতে আগেকার পরিস্থিতিগুলিকে পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে।’ ১৯১৮ এবং ১৯১৯ সালে মৌলভি বরকতুল্লা ও রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের নেতৃত্বে ভারতীয় প্রতিনিধিদল ব্রিটিশের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে মস্কোয় লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে, ১৯২০ সালের ২০ মে কাবুলের ভারতীয় বিপ্লবী সন্মিলনীর এক বার্তার জবাবে লেনিন মুসলিম ও অমুসলিমদের মৈত্রীকে স্বাগত জানিয়ে তা প্রাচ্যের সকল মেহনতি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার আশা প্রকাশ করেন। এই সময়েই হিন্দি, উর্দু, বাংলা, মারাঠি, ইংরেজি সহ ভারতের নানা ভাষায় লেনিনের জীবনী ও অক্টোবর বিপ্লব নিয়ে প্রচুর বই প্রকাশিত হতে শুরু করে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং ফাঁসির মধ্যে যাওয়ার ঠিক আগে লেনিনের জীবনী পড়ছিলেন। বইয়ের পাতা থেকে মুখ না তুলেই জেলারকে তিনি বলেছিলেন, ‘থামো! একজন বিপ্লবী এখন আর একজন বিপ্লবীর সঙ্গে কথা বলছে।’ লেনিনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি সংগঠনের নাম রেখেছিলেন ‘হিন্দুস্তান সোশালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন’। আন্দামানের সেলুলার জেলে বন্দি বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী লেনিনের তত্ত্বচর্চা করতেন এবং মুক্তি লাভের পর তাদের অনেকেই সমাজতান্ত্রিক আদর্শে ব্রতী হয়েছিলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে মনে করতেন এবং কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন— তাঁর প্রথম লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা, দ্বিতীয় লক্ষ্য শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ভারত। ১৯৩৩ সালের মে মাসে লন্ডনে পলিটিক্যাল প্ল্যানিং ফর ইন্ডিয়া ভাষণে বলেন ‘আমি সমাজতন্ত্রের পক্ষে’ কারণ আমি মনে করি এটিই ভারতের দারিদ্র, অশিক্ষা এবং শ্রেণি বৈষম্যের মতো প্রধান সমস্যাগুলো দূর করার একমাত্র পথ।’ এমনকি জহরলাল নেহরুর মতো বুর্জোয়া নেতারাও সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রভাব এড়াতে পারেননি। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সাফল্যে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

শুধু সশস্ত্র বিপ্লবী বা স্বাধীনতা সংগ্রামীরাই নন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩০ সালে রাশিয়া ভ্রমণের পর তাঁর ‘রাশিয়ার চিঠি’-তে লিখেছিলেন, ‘এখানে না এলে আমার এ জন্মের তীর্থদর্শন অসমাপ্ত থাকত।’ তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ‘যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনও দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া

সকল মানুষকেই এরা সমান করে তুলেছে।’ মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘পিতৃস্মৃতি’তে ... সেই গরিব চাষির কথা, যে বলেছিল— এ দেশে লেনিনের মতো একটা নেতা জন্মালে সব ঠিক হয়ে যেত।

রুশ বিপ্লবের বিশ্বব্যাপী প্রভাব এবং কল্যাণকামী রাষ্ট্রের উদ্ভব

রুশ বিপ্লব এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তিকে পরাজিত করার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার উত্থান গোটা বিশ্বের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে আমূল বদলে দিয়েছিল। রুশ বিপ্লবের পর থেকেই সোভিয়েত রাশিয়ায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান এবং শ্রমিকদের অধিকারকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর ফলে পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলো তো বটেই এমনকি ভারতের মতো সদ্য স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশগুলোও বুঝতে পারে যে, শ্রমিক শ্রেণিকে যদি ন্যূনতম সামাজিক সুরক্ষা, কাজের নির্দিষ্ট সময় এবং স্বাস্থ্যপরিষেবা, ন্যূনতম শিক্ষা না দেওয়া হয়, তবে তাদের দেশেও পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে যেতে পারে। এই বিপ্লব ভীতি থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্ব জুড়ে ‘ওয়েলফেয়ার স্টেট’ বা কল্যাণকামী রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হওয়ার পর ভারতও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আড়ালে একটি ‘কল্যাণকামী রাষ্ট্র’ গড়ার মোড়ক নেয়। বিশ্ব জুড়ে সাধারণ মেহনতি মানুষের সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রতি আকর্ষণ দেখে ভীত পুঁজিপতি শ্রেণির এ ছাড়া উপায় ছিল না। তাই না চাইলেও ভারতের শ্রমিক, কৃষক সহ সাধারণ মানুষের জন্য কিছুটা গণতান্ত্রিক পরিসর, কিছু অধিকার দিতে রাষ্ট্রকর্তারা বাধ্য হয়েছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে ‘পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা’ গ্রহণ করা হয়েছিল, সেখানেও সোভিয়েত রাশিয়ার মডেল অনুকরণের চেষ্টা হয়েছিল।

সদ্য স্বাধীন ভারতের সংকট এবং নিগশর্ত সোভিয়েত মিত্রতা

মেহনতি মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং শোষিত জাতির অধিকার রক্ষার লেনিনীয় নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের পাশে নিগশর্ত ভাবে এসে দাঁড়ায় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া। ভারতের ভূ-রাজনৈতিক সুরক্ষায় তারা পরম মিত্রের ভূমিকা নেয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে আমেরিকার সপ্তম নৌবহরের হুমকির মুখে রাশিয়া যেমন ভারতের ঢাল হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি কাশ্মীর ইস্যুতেও রাষ্ট্রসংঘে একাধিকবার ‘ভিটো’ প্রয়োগ করে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেয়।

সদ্য স্বাধীন খাদ্যসংকটে ভোগা ভারতের কৃষিব্যবস্থাকে আধুনিক করার ক্ষেত্রেও তারা সাহায্য করেছিল। ১৯৫৬ সালে রাজস্থানের সুরাটগড়ে এশিয়ার বৃহত্তম উন্নত যন্ত্রসমৃদ্ধ কৃষি খামার গড়ে তোলার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপুল পরিমাণ ট্রাক্টর ও আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম ভারতকে উপহার দিয়েছিল। সেই সময় ভারতের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ভারি শিল্পের প্রয়োজন ছিল। লেনিনের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় ভিলাই ও বোকারোর মতো

বৃহৎ ইস্পাত কারখানা তৈরি হয়। তাদেরই কারিগরি সহায়তা, অত্যাধুনিক ড্রিলিং রিগ সরবরাহ এবং বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনায় গুজরাট (অঙ্কলেশ্বর, ক্যান্সে) এবং আসামে তেল আবিষ্কৃত হয়। মূলত সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের হাত ধরেই ১৯৫৬ ওএনজিসি তার শক্তি ভিত্তি পায়। লেনিনের দেশের সহায়তায় ভারতে ১১টি বিদ্যুৎ স্টেশন (পুরো বা আংশিক) তৈরি হয়েছিল। এ ছাড়া যন্ত্র নির্মাণ, ওষুধ প্রস্তুত, কয়লা শিল্প, মৎস্য শিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রভূত সাহায্য পেয়েছিল।

কেবল অর্থনীতি বা রাজনীতি নয়, খেলাধুলা ও সংস্কৃতি জগতেও দু’দেশের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়। দাবা, জিমন্যাস্টিকস এবং ফুটবলের মতো ক্রীড়াক্ষেত্রে সোভিয়েত দলগুলোর ভারত সফর এবং প্রশিক্ষণ স্বাধীন ভারতের ক্রীড়াঙ্গণে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। ষাট দশক থেকে ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রে আধুনিকতার ছোঁয়াও আসে রাশিয়ার হাত ধরে। বায়োমেকানিক্স ও স্পোর্টস মেডিসিনের সূচনা হয় তাদেরই সাহায্যে। পশ্চিমী দেশগুলোর দামি সরঞ্জামের বিকল্প হিসেবে সম্ভাব্য ক্রীড়া সরঞ্জাম সরবরাহ এবং মস্কো বা কিয়েভে ভারতীয় দলগুলোকে উন্নত ট্রেনিং ক্যাম্পের সুযোগ দিয়েছিল তারা।

মূর্তি ভেঙে ফেললেও আদর্শ বেঁচে থাকে

আজ মহান লেনিনের মূর্তির ওপর আরএসএস ও বিজেপি-র এই নগ্ন আশ্ফালন আসলে মেহনতি মানুষের অধিকারের ওপর এক সুপরিকল্পিত আক্রমণ। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ শ্রমিক মেহনতি মানুষের কাছে বোমা-বন্দুকের চেয়েও শক্তিশালী হাতিয়ার যাকে সব দেশের শোষক শ্রেণি অত্যন্ত ভয় পায়। এই ভীতি থেকেই তাদের এই আক্রমণ। লেনিন-মূর্তি ভেঙে তারা বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের ভীত সন্ত্রস্ত করতে চায়। একচেটিয়া পুঁজির তোষণ, সাম্প্রদায়িক মেরুক্রণে রাজনীতি এবং নিজেদের মতাদর্শগত দেউলিয়াপনা ঢাকতেই তারা আজ উগ্র জাতীয়তাবাদের আড়ালে ইতিহাস বিকৃত করার এই বৃহত্তর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আশ্চর্যের বিষয় হল, যারা এক সময় ব্রিটিশদের কাছে মুচলেকা দিয়ে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস থেকে নিজেদের সযত্নে সরিয়ে রেখেছিল, ব্রিটিশের সহযোগী হিসাবে কাজ করেছিল, আজ তারা ই মেকি দেশপ্রেমের ধ্বজাধারী সেজে লেনিনকে ‘বিদেশি’ তকমা দিচ্ছে। যে সাম্যবাদী আদর্শকে তারা যুক্তির ময়দানে মোকাবিলা করতে পারছেন না, তাকেই আজ পেশিশক্তি আর হাতুড়ি দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে বিরোধী স্বরকে ভয় দেখাতে চাইছে।

কিন্তু এরা ভুলে গেছে, ইতিহাসকে বুলডোজার দিয়ে মুছে ফেলা যায় না। লেনিন কেবল মাটির বা ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য নন। তিনি মিশে আছেন এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবীদের দেখা শোষণমুক্ত যথার্থ গণতান্ত্রিক ভারত গড়ে তোলার স্বপ্নে। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ভারী শিল্প থেকে আধুনিক ভারত নির্মাণের বুনিয়াদে, শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং ও নেতাজির শেষ ইচ্ছায় এবং এ দেশের মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের প্রতিটি স্লোগানে। সাময়িক বাস্তব আর রাষ্ট্রীয় মদতে হয়তো রাস্তার ধারের মূর্তি ভাঙা যায়, কিন্তু মানুষের হৃদয়ে এবং শোষিত মানুষের লড়াইয়ের ময়দানে প্রোথিত আদর্শের যে মূর্তি, তাকে মুছে ফেলার ক্ষমতা কোনও স্বৈরাচারের নেই।

আমিষ-নিরামিষ বিতর্ক ছেড়ে সরকার বরং দেখুক মানুষ ভাত পাচ্ছে কি না

কথায় আছে আপ রুচি খানা। অর্থাৎ আপনার রুচিমতো আপনি খাবেন। এর পর অনিবার্য ভাবে খাদ্য সম্পর্কিত যে বিষয়টা প্রয়োজনমতো মানতে হয়, তা হল ডাঙারি পরামর্শ, পুষ্টিবিদের মতামত। গায়ের জোরে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, কোনও সুস্থ চিন্তার মানুষ মেনে নেবে না। কারণ এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে শুধু তার শরীরের ভালোমন্দ নয়, মানসিক তৃপ্তি-অতৃপ্তিও।

বাংলার রাজনীতিতে পট পরিবর্তন হয়েছে মাত্র মাস চারেক আগে। ক্ষমতায় আসার প্রায় সাথে সাথেই নতুন সরকার গায়ের জোরে উচ্ছেদ, তোলাবাজি, দখলদারি, আইন পরিবর্তন, শিক্ষাঙ্গনের মাথায় দলীয় লোকদের বসানো ইত্যাদি দলতান্ত্রিক তাণ্ডবচালিয়ে যাচ্ছে। এর মাঝেই বিজেপি নেতৃত্বাধীন বঙ্গে প্রথম দুর্গোৎসব আসতে চলেছে এবং বিজেপি-ঘনিষ্ঠ কোনও এক ‘বাগেশ্বর বাবা’র কতকগুলো মন্তব্যে তুমুল আসর গরম হয়েছে। হাওড়ায় সাম্প্রতিক এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এবং বেশ কয়েকজন বিজেপি এমএলএ সহ ভক্ত-পরিবৃত্ত বাবাজি জোর গলায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, যাঁরা দুর্গাপূজার সময় আমিষ খান, তাঁরা আসলে ভণ্ড। এই সব আমিষভোজীদের সমাজচ্যুত করার ডাকও সে দিন দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর এ হেন জ্ঞানবাণীতে সাধারণ বাঙালির সেন্টিমেন্টে সরাসরি কতখানি আঘাত লাগবে, তিনি যে চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই আরএসএস-বিজেপির নেতারা জানেন না, এমন নয়। তাঁরা ভাল করেই জানেন, টিল ছুঁড়লে তরঙ্গ উঠবেই। এই তরঙ্গ তোলাটাই ছিল তাঁদের আসল উদ্দেশ্য। এর মধ্যে দিয়ে মার্কামারা উগ্র হিন্দুত্বের উত্তরভারতীয় সংস্কৃতিটি বাঙালির ঐতিহ্যবাহী উদারবাদী সংস্কৃতির ওপর চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালাতে চাইছেন তাঁরা।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। মানুষের সংস্কৃতি ও আবেগের সাথে এ সব গভীরভাবে যুক্ত। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিবাদ করেছেন মানুষ। বাগেশ্বর বাবার গ্রেফতারির দাবিও উঠেছে। পাশ্চাত্য কেউ কেউ বলেছেন— পুজোয় ফিশ্ফ্রাই, মার্টিন বিরিয়ানি খাব ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিন্তু আমিষ-নিরামিষের এই তরজায় অন্য একটি প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে, যাদের দু'বেলা পেটভরা ভাতের

জোগাড় করতে পারাটাই ভীষণ কঠিন। যে হকার পরিবারগুলোর জীবিকা কেড়ে নেওয়া হল, বু পড়িবাসী যেসব মানুষ মাথার উপরের ছাউনিটুকুও হারাল, তারা কি এই উৎসবে আমিষ-নিরামিষ নিয়ে মাথা ঘামানোর পরিস্থিতির মধ্যে আদৌ আছে, নাকি বেঁচে থাকার, কোনওক্রমে টিকে থাকার লড়াই লড়তে জীবনপাত করে চলেছে?

জিনিসপত্রের দাম আগুন। তেল, চিনি, ডাল, রান্নার গ্যাস ইত্যাদির দাম লাগামছাড়া বাড়ছে। হেঁসেল সামলাতে, মধ্যবিত্তের পকেটেই টান। এই অবস্থায় বন্ধ কারখানার শ্রমিক, মুটে-মজুর, রিকশাচালক-ঠেলাওয়াল, উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া ছোট দোকানদার কিংবা ফুটপাথবাসী অসংখ্য মানুষ মাছ-মাংস দূরের কথা— দু'মুঠো ভাত জোগাড় করছে কী উপায়ে! এই সমস্ত বিষয়ে প্রশ্ন ওঠা চাপা দিতেই আমিষ-নিরামিষ বিতর্ক খুঁচিয়ে তুলেছে বিজেপি।

‘উড়ে এসে জুড়ে বসা’ কোনও এক বাবাজির অর্বাচীন মন্তব্যের প্রতিবাদের পাশাপাশি আরএসএস-বিজেপি নেতাদের এই কৌশলকে মাথায় রাখা দরকার।

ভারত নাকি বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ, অথচ আজও এ দেশে প্রতি ৩ জন শিশুর মধ্যে ১ জন কোনও না কোনও ভাবে অপুষ্টিতে ভোগে। অপুষ্টির কারণে শিশুমৃত্যুর হার এ দেশে ৬৮-৬৯ শতাংশ। মেয়েরা, বিশেষত গর্ভবতী মহিলাদের ৫২.২ শতাংশই রক্তাক্ততার শিকার। এখনও বহু এলাকা আছে যেখানে মানুষ জঙ্গলের শাকপাতা, মাটির তলা থেকে তুলে আনা কন্দ খেয়ে বেঁচে থাকে। এই সব মানুষের কাছে আমিষ-নিরামিষ বিতর্কের কোনও মূল্য আছে কি? কিন্তু এদের নিয়ে সরকারের বিন্দুমাত্র উদ্বেগ দেখা যায় না।

মানুষের জীবনের আসল সমস্যাগুলি সমাধানে সরকার যখন ব্যর্থ হয়, তখন তারা ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপের আশ্রয় নেয়, গায়ের জোর ফলায়। নানা কৌশলে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে অহরহ সেই ঘূর্ণিতে পাক খেতে বাধ্য করে, যাতে মানুষ নিজের অধিকার বুঝে নিতে প্রতিবাদী স্বর জোরালো করতে না পারে। রাজ্য সরকারের নানা ধরনের অবাস্তব কার্যকলাপ ও হুঙ্কারে তার ছাপই দেখা যাচ্ছে।

ও অন্যান্য বিষয়ের সিলেবাসে চরম বিকৃতি ইত্যাদির ফলে সামগ্রিক ভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে নেমে এসেছে সীমাহীন বিপর্যয়। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিল এবং ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক ধারণার ভিত্তিতে প্রণীত জনগণের শিক্ষানীতি-২০২৬ চালুর দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে প্রকৃতি-পরিবেশ-জীবিকা আলোচনা সভায় বামদলগুলি

বিশ্ব জুড়ে ভয়ঙ্কর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন মানুষের জীবন-জীবিকার পাশাপাশি প্রকৃতি-পরিবেশকেও নিজের করাল গ্রাসে টেনে নিচ্ছে। যুদ্ধ ও মুনাফাকেন্দ্রিক অর্থনীতি বেরোয়া ভাবে প্রকৃতি ধ্বংস করে চলেছে। ভারত সহ বিশ্ব জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন প্রতিরোধী আন্দোলন বর্তমানে খুবই জরুরি। এই উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করে অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ শাখা বামপন্থী দলগুলিকে যুক্ত করে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা সভা আয়োজন করে চলেছে।

৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার রামমোহন হলে ‘সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে জীবন জীবিকা ও প্রকৃতি’ শীর্ষক আলোচনাসভায় আলোচক ছিলেন এসইউসিআই(সি)-র ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্ত, সিপিআই(এম)-এর পলাশ দাস, সিপিআই-এর শুভম ব্যানার্জী, আরএসপি-র মৃন্ময় সেনগুপ্ত, সিপিআই(এমএল)-লিবারেশনের মলয় তিওয়ারি, সিপিআই(এমএল)-রেড স্টারের শংকর,



সিপিআই(এমএল)-মাস লাইনের অলীক চক্রবর্তী ও এমকেপি-র আভাস মুন্সী। সভাপতিত্ব করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেবব্রত বেরা।

বক্তারা সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান আক্রমণাত্মক রূপ এবং মুনাফাকেন্দ্রিক রাজনীতি-অর্থনীতি জীবন-জীবিকার পাশাপাশি পরিবেশকে কীভাবে ধ্বংস করছে, তা নিয়ে আলোচনা করেন।

এর বিরুদ্ধে তাঁরা গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল জনগণকে একত্ববদ্ধ করতে বামপন্থী শক্তিগুলির একত্ববদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব আলোচনা করেন। এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তাঁরা সংগঠনকে অভিনন্দন জানান। কনভেনশনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী অর্কপ্রভ।

উচ্ছেদের আশঙ্কায় মল্লিকঘাট ফুলবাজার

এ বার উচ্ছেদের বুলডোজার মল্লিকঘাট ফুলবাজারের দিকে। এশিয়ার বৃহত্তম ফুলবাজার এটি। এই বাজারে নদিয়া-পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর-হাওড়া সহ বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী কেনা-বেচার কারণে আসেন। এখানকার ফুল দিল্লি-মুম্বই-পাটনা-ভুবনেশ্বর সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ট্রেন বা বিমানযোগে যায়। আবার দিল্লি-ব্যাঙ্গালোর সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের নানা ধরনের ফুল এই বাজারে আসে। এমনকি থাইল্যান্ড সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকেও উন্নতমানের ফুল এই বাজারে আসে। ৩৪০০ বর্গমিটার জায়গার উপর রয়েছে ২৪৪টি ছোট ছোট স্টল। ২০০২ সালে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হটিকালচার দপ্তরকে মাত্র এক টাকার বিনিময়ে ৯৯ বছরের জন্য লিজ দেয়। সম্প্রতি বাগবাজার থেকে

মিলিনিয়াম পার্ক পর্যন্ত গঙ্গার সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পে ওই বাজার সংলগ্ন গঙ্গার পাড় বন্দর কর্তৃপক্ষ শক্তপোক্ত করার কাজ করছে। বন্দর সূত্রে জানা গেছে, এই প্রকল্পে এই বাজারটি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে রাজ্যের কয়েক হাজার ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী চরম সমস্যার সম্মুখীন হবে। শুধু তাই নয়, ফুলচাষ ও ফুলবিপণনের সাথে যুক্ত রাজ্যের কয়েক লক্ষাধিক পরিবার ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কোটি কোটি টাকার ফুলব্যবসা চরম ক্ষতির মুখে পড়বে।

ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির দাবি— উচ্ছেদ পরিকল্পনা বাতিল করে বাজারটি আধুনিক করা হোক। সমিতির সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক জানান, এই দাবিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও হটিকালচার দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

এআইএমএসএস-এর উত্তর দিনাজপুর সম্মেলন

২০ সেপ্টেম্বর রায়গঞ্জে এআইএমএসএস-এর উত্তর দিনাজপুর চতুর্থ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, নারীর সমানাধিকার ও মর্যাদার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমরেডস ট্রুপ্পা দাসকে সভাপতি, মাধবী দত্তকে সহ-সভাপতি, শুক্লা বর্মনকে সম্পাদিকা ও নমিতা ঘোষকে কোষাধ্যক্ষ করে নয় জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। মূল বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মাধবী প্রামাণিক, উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বাবলি বসাক ও জেলা নেত্রী কমরেড মাধবীলতা পাল।



কর্মশালা ত্রিপুরায়

একের পাতার পর

ত্রিপুরা চ্যাপ্টারের সম্পাদক অসিত দাস। মূল আলোচক ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ডঃ মৃদুল দাস। তিনি দেখান, সারা দেশে ইতিমধ্যেই ৯৪ হাজার সরকারি স্কুল বন্ধ করা হয়েছে। শিক্ষার ব্যাপক বেসরকারিকরণ ও ব্যবসায়ীকরণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান